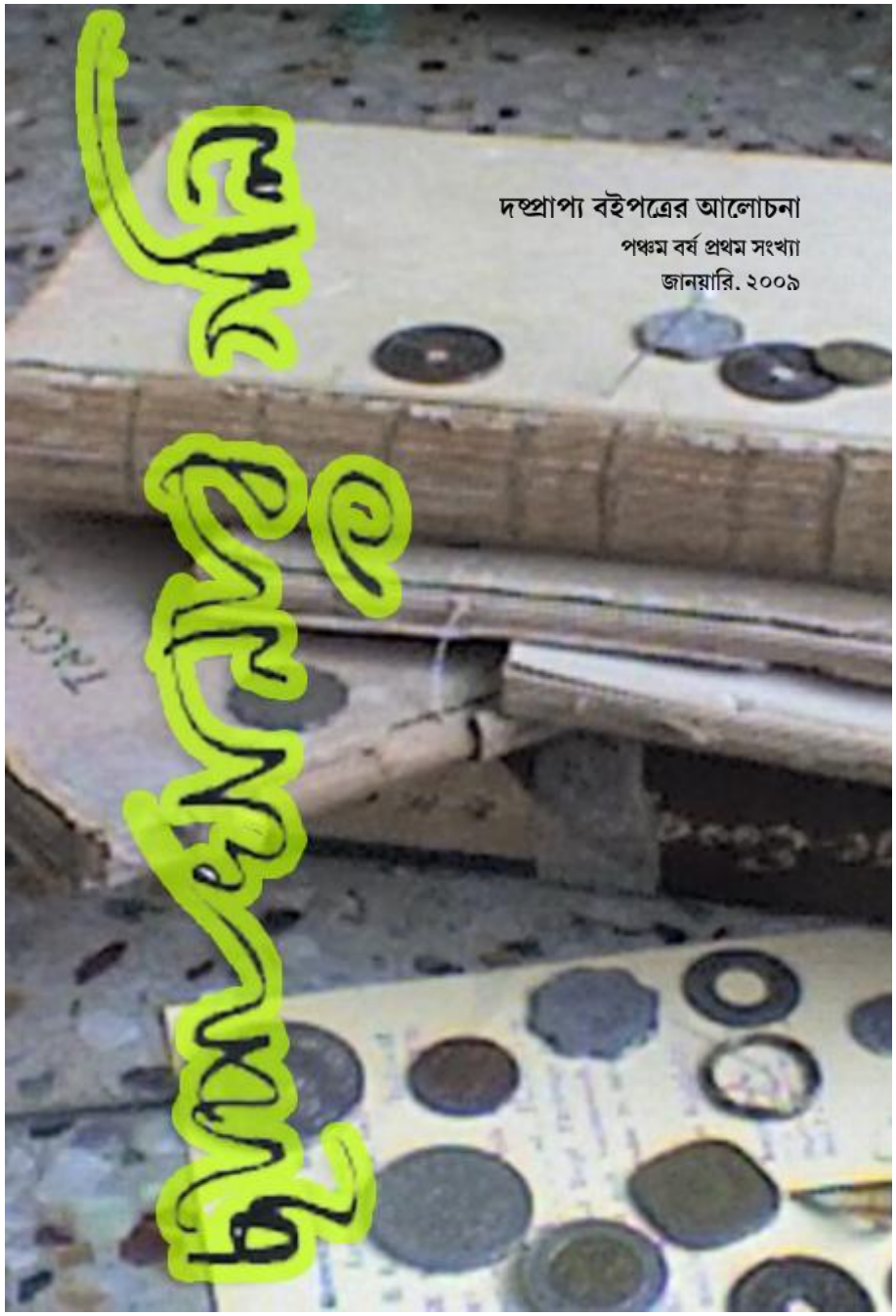

ছাপাখানার গলি
আলোচনার কাগজ
জানয়ারি. ২০০৯

আমাদের কথা		৩
প্রবন্ধ		
প্রফল্লচন্দ্র রায় ঃ আত্মচরিত	জহর সেন	৪
সামাজিক-আর্থিক অনুষঙ্গে অধ্যাপক সকমারী ভট্টাচার্য সম্মাননা গ্রন্থ	সৌম্যেন্দ্র কমার গুপ্ত	৯
বই দুষ্প্রাপ্য এবং তার বঙ্কিমচন্দ্র-কত সমালোচনাও	অমিত্রসদন ভট্টাচার্য	১৮
বক্তব্য : ধর্জটিপ্রসাদ মখোপাধ্যায়	বিপ্লব মাজী	২২
একটি দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা নীরদ চন্দ্র চৌধরী সম্পাদিত 'সমসাময়িক'	সন্দীপ দত্ত	৩০
পর্বজন্মের ধলো খঁজে	জয়া মিত্র	৩৩
একটি হারিয়ে যাওয়া বই এবং দজন ভলে যাওয়া মানষ	জাহিরুল হাসান	৩৭
দুঃস্বপ্নময় স্মৃতির শহরের গল্প জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১)	নাসির আহমেদ	৪৪
বর্ণাঢ্য ভদেব ভগত	বিশ্বজিৎ সেন	৪৭
অনেকদিন আগেকার আকাশ কি খব কাছে?	অনপম মখোপাধ্যায়	৫০
অনাবিল মমতায় ভুলে যাওয়া ইতিহাসের উন্মোচন	নাসিম-এ-আলম	৫৭
বসন্তের রেশমগুটি	সজয় বিশ্বাস	৬০

ছাপা খানার গলি
আলোচনার কাগজ
জানয়ারি, ২০০৯

সম্পাদক
দেবাশিস সাহা

সহ সম্পাদক
অংশুমান রায়

দপ্তরের ঠিকানা
১০৭/৬ বিষ্ণুপুর রোড
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
০৩৪৮২-২৬৭৩৪৫
৯৪৩৪০৪১৯৫৬

আমাদের কথা

যখন টকরো টকরো হওয়ার জন্য লাফাচ্ছে দেশের মাটি তখন আমদের ভাবনা একান্নবর্তী। রবিবার-এর সাথে এক মলাটে বন্দী। এক উঠোনে ভিন্ন পসরা, ভিন্ন স্বাদ। আপনাকেও স্বাগত। আমাদের অভিপ্রায় নিয়ে আপনার মতামত জরুরি।

ছাপাখানার গলি ভীষণ-ই বিলম্ব ও অনিয়মিত। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। অনেকেই মখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, কথা বলছেন না। আমাদের দশা একট উপলব্ধি করুন। বিজ্ঞাপনহীন ধমনী নিয়ে হৃদযন্ত্র বিকলাঙ্গ। এ ধরনের কাগজে সবাই বিজ্ঞাপনে বিমখ। লেখক-কবিবন্ধ-সহৃদদের কাছে আবেদন আপনাদের বই ও পত্রিকার বিজ্ঞাপন দিন স্বল্প টাকায়। ছাপাখানার গলি বেরুবেই তবে অনিয়মিত। এ প্রচেষ্টায় আপনার লেখা আপনার বিজ্ঞাপন এ কাগজের জল-বাতাস। সন্ত্রাসে আক্রান্ত আমাদের দেশ। দেশে সন্ত্রাসে মদতদাতা, আশ্রয়দাতার সংখ্যা বাডছে। এদের নির্মল করতে পারলেই সন্ত্রাসমক্ত হবে এ ভারত।

নিরপরাধ মত্যর প্রতি শোক ও মতের পরিবারকে জানাই আমাদের সমবেদনা।

প্রফল্লচন্দ্র রায় ঃ আত্মচরিত

জহর সেন

প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী নিছক একজন সৃষ্টিশীল কৃতি বিজ্ঞানীর আত্মকথা নয়। অজস্র শ্রুতকীর্তি মানষের গড়ে ওঠার কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে তাঁর *আত্মচরিত* গ্রন্থে। বাল্যকালে কারলাইল (Carlyle) ছিলেন তাঁর আদর্শ। ইতিহাস, কবিতা ও দর্শনশাস্ত্র ছিল কারলাইল-এর প্রিয় বিষয়। ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি সাহিত্যে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। মেকলের (Macaulay) গভীর জ্ঞানস্পৃহা মুগ্ধ করেছে প্রফুল্লচন্দ্রকে। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নিউটন (Newton) আবিষ্কার করেন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব। স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় কোলরিজ লেখেন তাঁর সুদীর্ঘ কবিতা কুবলাই খাঁ। মার্কিন দার্শনিক এমারসন (Emerson) লেখেন, "পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতা, বন্ধু, অনেক অনেক দিন তোমাদের সঙ্গে কাটিয়েছি। কিন্তু এখন থেকে আমি সত্যসন্ধানী, সত্যদাস।" প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মূল বক্তব্য হল কারলাইল, মেকলে, নিউটন, কোলরিজ, এমারসন প্রভতি মহাপ্রাণ মানষ জীবনের একটি মহর্তও নষ্ট করেননি, সময়ের অপব্যবহারও করেননি।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন-এর আত্মজীবনী পড়ার জন্য পাঠককুলকে প্রফুল্লচন্দ্র আকুল অনুরোধ করেছেন। ফ্রাঙ্কলিনের জন্ম অতি দরিদ্র পরিবারে। প্রথাগত স্কুল কলেজের শিক্ষা তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। ছাপাখানায় কাজ করতেন। বই কেনার পয়সা ছিল না। পুস্তক বিক্রেতাদের কাছ থেকে বই ধার করতেন। সারারাত ধরে পড়তেন। সকালবেলা ফেরৎ দিতেন। দক্ষ হলেন ছাপাখানার কাজে। আপন উদ্যোগে বিদ্যুৎ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা করলেন। বিজ্ঞানী হিসাবে বিখ্যাত হলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সাফল্যের কারণ হিসাবে তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতা অবিস্মরণীয়। প্রফুল্লচন্দ্রের মতে ফ্রাঙ্কলিন-এর যাবতীয় সাফল্যের চাবিকাঠি হল তিনি কখনও সময়ের অপব্যবহার করেননি।

কিশোর বয়সেই প্রফুল্লচন্দ্র বারংবার পড়েছিলেন স্কট (Scott), ডিকেন্স (Dickens), থ্যাকারে (Thakeray), ভিক্টর হুগো (Victor Hugo), তুর্গেনিভ (Turgeniev), তলস্তয় (Tolstoy) প্রমখ বিশ্ববন্দিত ঔপন্যাসিকের কালজয়ী উপন্যাস। তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে গোল্ডস্মিথ (Goldsmith) লিখিত The Vicar of Wakefield উপন্যাসটি। উপন্যাসটির চরিত্রগুলি অসামান্য মানবিক গুণসম্পন্ন। প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রগঠনে ওই উপন্যাসটির প্রভাব ছিল অপরিমেয়।

কর্মনিষ্ঠ মানুষই সৃজনশীল হতে পারেন। অলস মস্তিষ্কেই শয়তানি প্রশ্রয় পায়। তাঁর জীবন সাধনায় প্রফুল্লচন্দ্র অনুক্ষণ স্মরণ করেছেন ইংরেজ ঐতিহাসিক গ্রোটকে (Grote)। উনিশ শতকে গ্রেট ব্রিটেন-এ তিনি ছিলেন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অগ্রগণ্য ব্যক্তি। ষোলো বছর বয়সে পিতার নির্দেশে ওই পৈত্রিক ব্যবসায় তিনি যোগ দেন। বত্রিশ বছর তিনি প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্যবসার কাজে চরম ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রতিদিন আট ঘন্টা লেখাপডা করতেন। ১৮৪৩

খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পর বারো খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাঁর বিশ্ববন্দিত গ্রন্থ গ্রিসের প্রাচীন ইতিহাস। দু'জন স্থিতধী মানুষের কথা প্রফুল্লচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। তুর্কী বীর কামাল পাশা ছিলেন অসমসাহসিক যোদ্ধা, দক্ষ রাজনীতিবিদ এবং দুঃসাহসী সংস্কারক। অসংখ্য কাজে তিনি লিপ্ত থাকতেন। যোগাযোগ রাখতেন অগণিত মানষের সঙ্গে। তিনি ছিলেন স্থিতধী। তাই মনঃসংযোগ ক্ষমতায় তিনি বলীয়ান ছিলেন।

একটি জীবন্ত উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে তিনি উপস্থিত করেছেন। প্রতিদিন মহাত্মা গান্ধী পেতেন শত শত টেলিগ্রাম ও চিঠি। ভাইসরয়, হোম সেক্রেটারি থেকে অসংখ্য দেশি বিদেশি ও সমাজের নানা স্তরের সাধারণ মানুষ ছিলেন তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। প্রতিটি টেলিগ্রাম ও চিঠির তিনি উত্তর দিতেন। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। নিয়মিত লিখতেন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায়। পরে পত্রিকাটি 'হরিজন' পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। প্রফুল্লচন্দ্রও তাঁকে চিঠি লিখতে কুণ্ঠাবোধ করতেন। গান্ধীজীর এতটুকুও সময় নষ্ট হোক, প্রফুল্লচন্দ্র তা চাইতেন না। নানা কাজে ব্যস্ততার মধ্যেও সংবাদপত্রে উত্তর বঙ্গে বন্যার খবর পড়ে গান্ধীজী মুমবাই-এর সংবাদপত্র মারফৎ সাহায্যের আবেদন জানান। কর্মযোগী গান্ধী অনুশীলন করেছেন স্থিতপ্রজ্ঞ যোগ। তাই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করতে পারতেন। তাঁকে দেখে প্রফুল্লচন্দ্র অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর *আত্মচরিত* গ্রন্থে উনবিংশ পরিচ্ছেদে প্রফুল্লচন্দ্র জাতীয় দুর্গতির জন্য কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট বনাম আত্মচেষ্টায় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে কর্মকুশলতার বিচারে আকাশপাতাল তারতম্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যবসায়ে সাফল্যের বাধাস্বরূপ, শ্রমের প্রতি অবজ্ঞা জাতীয় সঙ্কটের লক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি, বিদেশি ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়াতে বিরাট শক্তির অপব্যয়, বিদেশি উপাধির মোহ, দাস মনোভাব, হীনতা-বোধ ইত্যাদি।

সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর নিজের হাতে গড়া সুবিখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস-এর জন্ম ও বিকাশ। তিনি লিখেছেন:

> ইউরোপে শিল্প ও বিজ্ঞান পাশাপাশি চলিয়াছে। উভয়েরই এক সঙ্গে উন্নতি হইয়াছে। একে অপরকে সাহায্য করিয়াছে বস্তুত আগে শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার পর আসিয়াছে বিজ্ঞান। সাবান তৈয়ারী, কাঁচ তৈয়ারী, রং এবং খনি হইতে ধাতুর উৎপত্তি বিগত দুই হাজার বছর ধরিয়া লোকে জানিত। রসায়ন শাস্ত্রের সঙ্গে ঐ সমস্ত শিল্পের সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইবার বহু পূর্ব হইতেই ঐগুলির উদ্ভব হইয়াছিল। অবশ্য বিজ্ঞান শিল্পকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

বিজ্ঞানের গবেষণা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠা গড়ে তোলা. এই দুটি কাজই তাঁর কাছে ছিল অভিন্ন ব্রত। হ্যাণ্ডনোট দিয়ে যৎসামান্য অর্থ পেলেন। ১০×১০×৭ কিউবিক ফিট মাপের দুটি ঘর পেলেন কারখানার জন্য। হতাশায় ভেঙে পড়লেন না। কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর জীবনসাধনা থেকে তিনি প্রেরণা পেলেন। লে ব্ল্যাঙ্ক আধুনিক 'অ্যালকেমি'র আবিষ্কর্তা। দারিদ্র্যের মধ্যে হাসপাতালে তিনি মারা যান। জেমস ওয়াট, স্টিফেনসন, আর্করাইট হারগ্রিভস, বার্ণার্ড পলিসি প্রভৃতি বিজ্ঞানীর জন্ম দরিদ্রের ঘরে। ইউরোপের বিখ্যাত এঞ্জিনিয়াররা ছিলেন অতি সাধারণ গৃহস্থের সন্তান। সাজিমাটি থেকে কার্বনেট অব সোডা প্রস্তুত করলেন তিনি। ফসফেট অব সোডা এবং সপার ফসফেট অব লাইম নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন

দু'জন প্রতিভাশালী ব্যক্তি। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) এবং সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (পরবর্তীকালে তিনি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন)। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের প্রবর্তক রাধাগোবিন্দ কর, অমূল্যচরণ বসু এবং নীলরতন সরকার ও সুরেশ প্রসাদ সর্বাধিকারী প্রমুখ স্বদেশপ্রেমিক চিকিৎসকগণ বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত এটকিনস সিরাপ, সিরাপ অব হাইপো ফসফাইট অব লাইম. টনিক গ্লিসেরোফসফেট. প্যারিস কেমিক্যাল ফড প্রভতি ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদে প্রফুল্লচন্দ্র আলোচনা করেছেন দেশিয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভবের ইতিহাস। বাঙালি উদ্যোগীরা কীভাবে অশেষ বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও নানা ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার বিশ্লেষণ করেছেন প্রফল্লচন্দ্র অতি নিপণভাবে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।

প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস-এর উদ্ভবের ইতিহাস। ১৯০১ সালে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহল অঞ্চলে মঙ্গলহাট নামক স্থানে পোর্সিলেন এবং মৃৎশিল্পের উপযোগী চিনামাটি আবিষ্কৃত হয়। কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন এবং হেমেন্দ্রনাথ সেন, এই তিনজন একটি প্রাইভেট কোম্পনি গঠন করেন। হাইকোর্টে ওকালতি করার জন্য হেমেন্দ্রনাথ সেন কলকাতায় চলে আসেন। একটি পুকুরের ধারে কয়েকটি কুটিরে কোম্পানির কাজ শুরু হয়। শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হলেন কয়েকজন কুম্ভকার। মৃৎশিল্পে বিশেষজ্ঞ কাউকে পাওয়া যায়নি। প্রথম প্রথম কৃষ্ণনগরের কয়েকজন কারিগরের সাহায্যে নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক মাটির পুতুল ও খেলনা তৈরির কাজ শুরু করেন। বাজারের উপযোগী কোনও জিনিস তৈরি করতে তিনি পারেননি। পরে সত্যসুন্দর দেব নামে এক যুবককে জাপানে পাঠানো হয়। টোকিও এবং কিওটোর শিল্প বিদ্যালয়ে তিনি মৃৎশিল্প শিক্ষা করেন। ১৯০৬ সালের শুরুতেই তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। কলকাতা পটারি ওয়ার্কস-এর দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হল।

মালিকেরা চেয়েছিলেন ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি। তাই পোর্সিলেন-এর দ্রব্য তৈরির দিকে তাঁরা মনোযোগী হলেন। বেলেঘাটা রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ৪৫ নং ট্যাংরা রোডে তিন একর জমি ইজারা নেওয়া হয়। এখানেই নির্মিত হয় কারখানা গৃহ। চুল্লি তৈরি সম্পন্ন হয় ১৯০৭ সালে। ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। জাপানি কারিগররা আসেন স্থানীয় কারিগরদের কাজ শেখানোর জন্য। জাপানি ও জারমান দ্রব্য ছিল বাজারদরের তুলনায় সস্তা। প্রতিযোগিতায় দেশি মালের চাহিদা কমতে শুরু করে। ১৯১৩ সালে সত্যসুন্দর দেবকে জারমানি-তে পাঠানো হল আধুনিকতম পোর্সিলেন ও মৃৎশিল্প প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার জন্য। ১৯০৬ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত দশ বৎসরের বিবরণীতে দেখা যায়, ওই কালপর্বে উৎপন্ন জিনিসের মূল্য ছিল ২,০২,৯৫২ টাকা। এর মধ্যে বিক্রয় হয়েছিল ১.৯২.৮২৭ টাকা মল্যের জিনিস। মালিকরা ব্যবসায়ে নিয়োগ করেছিলেন প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা পটারী ওয়ার্কস দশ লক্ষ টাকা মূলধনসহ লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হল 'বেঙ্গল পটারিজ লিমিটেড' নামে। ১৯২০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্তএই কোম্পানি নিদারুণ অর্থকষ্টে বিপর্যস্ত ছিল। কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং বহরমপরের বৈকণ্ঠনাথ সেন এবং হেমেন্দ্রনাথ সেন প্রতিষ্ঠানটিকে প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ

পোষণ করেছেন। এই ব্যবসায়ে ৫০ শতাংশ বিনিয়োগ তাঁরাই করেছেন। মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং হেমেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়। বেঙ্গল পটারিজ কোম্পানি ছাড়া বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস লিমিটেড এবং স্বদেশি জাহাজ-শিল্পের অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র বিশদ আলোচনা করেছেন প্রাথমিক আকরের ওপর নির্ভর করে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন গান্ধীদর্শনের সাকার ভাষ্য। এই বক্তব্যের বিশ্লেষণ অতি প্রাসঙ্গিক। সাধারণভাবে সত্যব্রত গান্ধী শিষ্য হিসাবে গান্ধীজীর অনুমোদন অনুসারে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়। তাঁরা হলেন মগনলাল গান্ধী, বিনোবা ভাবে, নরহরি পারিখ, মহাদেব দেশাই, কিশোরলাল মশরুয়ালা, মীরা বেন, রবিশঙ্কর মহারাজ, বাদশা খাঁ, জীবতরাম ভগবানদাস কৃপালনী, জাকির হুসেন, জে. সি. কুমারাপ্পা ও জগতরাম দাভে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হলেন শিক্ষক, কেউ আইনজীবী, কেউ বা সমাজকর্মী। কেউ কিন্তু বৈজ্ঞানিক নন। কিন্তু অবিভক্ত বঙ্গদেশের সৌভাগ্য তিনজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি বৈজ্ঞানিক গান্ধীজীর গঠন কর্মাত্মক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের গবেষক-লেখক প্রফুল্লচন্দ্রের উচ্চমানের রসায়ণ-গবেষণা ভুবন-বিখ্যাত। বাইও-কেমিস্ট্রি বিষয়ের গবেষণায় প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছিলেন অগ্রদূত। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। গান্ধীজীর নির্দেশে তিনি গড়ে তোলেন সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান। সেখানে তিনি আত্মনিয়োগ করেন জনকল্যাণমুখী প্রায়োগিক বিজ্ঞানের গবেষণাকর্মে।

১৯০২ সালের ১৯ জানুয়ারি কলকাতার অ্যালবার্ট হলে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। এই সভার বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালের ২০ জানুয়ারি সোমবারের *ইংলিশম্যান* পত্রিকায়। সভার উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এটাই হল কলকাতার জনসভায় গান্ধীজীর প্রথম আবির্ভাব। নরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন সভাপতি। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্যারীমোহন মুখার্জী, গোখেল, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, অধ্যাপক কাথাভাতে প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তি। গান্ধীজীর বক্তৃতার সারাংশ প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর *আত্মচরিত* গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন। গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মধারার ওপর তাঁর অগাধ আস্থা তিনি সুব্যক্ত করেছেন ওই গ্রন্থের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে 'চরকার বার্তা—কাটনীর বিলাপ' শিরোনামে। তিনি লিখেছেন:

> মহাত্মা গান্ধী যেদিন চরকার বার্তা প্রচার করেন, তখন হইতেই আমি ইহার সত্য উপলব্ধি করিয়াছি। আমি নিজে ক্ষুদ্রাকারে হইলেও একজন শিল্পব্যবসায়ী, সুতরাং প্রথমতঃ আমি এই আদিম যুগের যন্ত্রটির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশই করিয়াছিলাম। কিন্তু বিশেষ চিন্তার পর আমি বুঝিতে পারিলাম—প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে এই চরকা কত উপকারী, অবসর সময়ে এই চরকায় কত কাজ হইতে পারে। ভারতের যে সব লক্ষ লক্ষ লোক অতি কষ্টে অনশনে অর্দ্ধাশনে জীবন যাপন করে, তাহাদের পক্ষে এই চরকা জীবিকার্জ্জনের একমাত্র গৌণ উপায়। চরকাকে দরিদ্রের পক্ষে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে আত্মরক্ষার উপায় বলা হইয়াছে। এ উক্তি সঙ্গত। খুলনা দুর্ভিক্ষ এবং উত্তরবঙ্গ বন্যা সম্পর্কে সেবাকার্য্যে কাজ করিবার সময় আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, যদি এক শতাব্দী পূর্বে চরকা পরিত্যক্ত না হইত, তবে উহা অনাহারে ক্লিষ্ট জনসাধারণের পক্ষে বিধাতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ হইতে

পারিত।

সরকারি প্রতিবেদন ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের মহামল্য মতামত তিনি উৎকলন করেছেন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের *আত্মচরিত* গ্রন্থের যৎসামান্য পরিচয় এই প্রবন্ধে উল্লেখ করলাম। প্রবন্ধটির শেষে উল্লেখ করছি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার্ঘ্য। ১১ ডিসেম্বর ১৯৩২। স্থান কলকাতার টাউন হল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মোৎসব। জন্মোৎসব কমিটির সভাপতি ছিলেন নীলরতন সরকার। ওই সভায় সভাপতির আসন অলংকত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকর। তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ

> আমরা দু'জনে সহযাত্রী। কালের তরীতে আমরা প্রায় একঘাটে এসে পৌঁছেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।
>
> আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে।
>
> বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক। আচার্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন। কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়। আচার্য নিজের জয়কীর্তি স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে—পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।
>
> আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।

আত্মচরিত
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
চক্রবর্তী এণ্ড কোং. কলকাতা

এখন বাংলা কবিতার কাগজ
সম্পাদনা
অতন বন্দ্যোপাধ্যায়
দপ্তর
৬৫. দেশবন্ধুনগর, ডাক ও জেলা : জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
মোবাইল : ৯৪৩৪৭৪৬৬০০, ৯৪৩৪০৫৫৫৫৮
e-mail : ekhon_jpg@yahoo.co.in

সামাজিক-আর্থিক অনুষঙ্গে
অধ্যাপক সকমারী ভট্টাচার্য সম্মাননা গ্রন্থ

সৌম্যেন্দ্র কমার গুপ্ত

শ্রদ্ধেয়া সুকুমারী ভট্টাচার্য সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-রেজুয়ানুর-তসলিমা কাণ্ডে একেবারেই নিরুচ্চার থাকলেন না। ''বিভিন্ন সঙ্কটের মুহূর্তে তাঁর নির্ভীক উচ্চারণ' যেভাবে আমাদের প্রেরণার উৎস যুগিয়েছে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের পর্বে পর্বে তিনি যে প্রতিবাদী ভাবনা-চিন্তা-চরিত্রের ধারাবাহিক প্রমাণ রেখে গেছেন— কী জ্ঞানচর্চার জগতে কী সমকালীন সমস্যাবলীর বিচারে— তা এককথায় তুলনারহিত। নানা বিভ্রাট এবং চাপের সম্মুখীন হয়েও তিনি মুহূর্তের জন্যও আত্মসমর্পণ করেননি। বরং প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করার অর্থই এগিয়ে চলা— এই প্রত্যয়কে পাথেয় করেই তিনি এগিয়ে গেছেন এবং আজও তাঁর সেই এগিয়ে চলা অব্যাহত।'' দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের চাইতেও দুর্লভ চরিত্র সামাজিক জীবনে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ— এরকমের চরিতকথাও তাই একধরণের দুষ্প্রাপ্যতা অর্জন করে। এই কারনেই আমরা সমালোচনার জন্য বেছে নিয়েছি ''সকমারী ভট্টাচার্য সম্মাননা গ্রন্থ''— ''ভারত ও ভারততত্ত্ব অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ'' (India and Indology–past present and future) ভারতীয় ঐতিহ্যে নির্ভীক উচ্চারন এবং প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ডেকে আনে ''গার্গী বেশী জিজ্ঞাসা করলে তোমার মুণ্ডু খসে যাবে'' এরকম হুমকী, অথবা খনার মতো জিভ কেটে নেওয়ার ঘটনা। সুকুমারী, গার্গী এবং খনার মতই জিজ্ঞাসা এবং উচ্চারণকে থামিয়ে না দিয়ে ফলাফলের কোন তোয়াক্কা রাখেননি। আমরা এক নজরে তাঁর কিছু মন্তব্য দেখে নিতে পারি, ''যে ধন জনকল্যাণে খরচ হতো তা ব্যক্তিগত ভোগে লাগছে— রাষ্ট্র এতে খুশি, সমবেত কোনও প্রতিবাদ হতে পারছে না. পরিবারের খচরো সম্ভোগেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে বেশ বিপুল পরিমান অর্থ।''

''কুসংস্কার কী? যা যুক্তিসিদ্ধ নয়, শুধু লোকাচারের ঐতিহ্য বহন করে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং ঐ দীর্ঘ ঐতিহ্যের মর্যাদায় মানুষের সমাজে একাধিপত্য করছে। যা যুক্তিসিদ্ধ তা সংস্কার নয় ...। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কুসংস্কারগুলি থেকে রাষ্ট্র সরাসরি. আবার কখনো বা পরোক্ষভাবে লাভ করে।'' (শারদীয় দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৪১৪)

২। দ্বিচারিতা— ''দিল্লীতে গতকাল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তাঁর 'ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খাওয়া'' সম্বন্ধে মন্তব্যটি করা অন্যায় হয়েছিল। আর বলেছিলেন নন্দীগ্রামের সমস্ত ব্যাপারটাই প্রসাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যর্থতা' (আক্ষরিক অনুবাদ) তিনি এ-ও বলেছেন যে ''নন্দীগ্রাম থেকে যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি তা হল দেশের লোককে সঙ্গে নিয়েই সিদ্ধান্ত করা ও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।'' বলাবাহুল্য এ-গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা, ঠিক এই মহর্তে রিজওয়ান ও তসলিমার চেয়েও বেশি তাৎপর্যপর্ণ কথা পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে...।''

''এই সংবাদ প্রকাশে শাসকগোষ্ঠীর মুখপত্র গণশক্তির সংবাদপত্র হিসাবে যে দায়িত্ব ছিল তা একেবারেই পালন করা হয়নি। বরং পরো খবরটি আদ্যন্ত পডলে নন্দীগ্রাম সম্বন্ধে ধারনা হবে Gods in his Heaven /

and all's right in the world. এই ধারনা বিভ্রান্ত এবং বিভ্রান্তি প্রচার নিশ্চয়ই সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ নয়'' (দৈনিক স্টেটসম্যান, ৭.১২.০৭) আর সব দেশের মতো আমাদের দেশেও মানুষের অধিকার বারে বারেই লঙিঘত হচ্ছে। রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, আরো বহুরকমের দায়িত্বের মতো। কিন্তু এ লঙঘনের দায় রাষ্ট্র গ্রহণ করেনি, করে না। তা হলে কে এটা পালন করবে? কে জনগণের স্বার্থের সুরক্ষার প্রহরীর পদে আসীন থাকবে? ... দু চারটি সংস্থা নানা নামে এই ধরনের কাজ করে থাকে। তাদের মধ্যে 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি' বেশ কয়েক বছর ধরে এই কাজে আত্মনিবেদিত। ... দেশের জনগণ আজ জানে যে, এই সংস্থাটি জনস্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে সর্বদাই এগিয়ে আসে, সাধ্যমত সংগ্রাম করে এবং প্রায়ই জয়ী হয়। ... একথা ঠিক যে প্রিয়ঙ্কা-রিজওয়ান সমস্যা রোজ দেখা দেবে না। এর আবর্তগুলি ভবিষ্যতে একদিন মিলিয়েও যাবে কিন্তু, 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির' এই নিরলস প্রচেষ্টা ইতিহাসে স্থায়ী স্থান পাবে। আর যে 'গণশক্তি' বহু সৎকাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে, এখনও মাঝে মধ্যে নেয় (যখন তারা কেবল সরকারের মুখপত্র থাকে না, তখন) সেই 'গণশক্তি' কীভাবে উল্লিখিত হবে? শুভ কাজের বিরোধিতা থেকে নিন্দাই জোটে।'' (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১/১১/২০০৭)

সাম্প্রতিক কয়েক মাসে করা সুকুমারী ভট্টাচার্যের উপরোক্ত উক্তিগুলির মধ্যে আমরা যে নির্ভীক উচ্চারণ ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের দেখা পাই তার প্রেরণাতেই আমরা সমালোচনার জন্য নির্বাচিত করেছি 'সুকুমারী ভট্টাচার্য সম্মাননা গ্রন্থ'টিকে। কেননা, তাঁর কথিত শাসকগোষ্ঠী, তাদের মুখপত্র 'গণশক্তি' এই গোষ্ঠীর সমর্থকবৃন্দ এবং নেতৃত্বের উদ্যোগেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড'-এর দ্বারা। এ-বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই যে সম্পূর্ণ সদর্থক ভাবনা থেকেই এই ''সম্মননা'' গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও রূপায়ন করা হয়েছিল। আমরা গ্রন্থটি সমালোচনার পূর্বে সুকুমারী ভট্টাচার্য সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেব।

জন্ম মেদিনীপুরে মামার বাড়িতে ১৯২১-এর ১২ জুলাই, যদিও পৈতৃক নিবাস হুগলির মহানাদে। খ্রিস্টান পরিবারের সুকুমারী দত্ত ছিলেন পিতা সরসীকুমার দত্ত ও মাতা শান্তাবালা দেবীর সন্তান। জন্মসূত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্তের উত্তরসূরী। সুকুমারীর ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও দর্শন পাঠের হাতেখড়ি ও অগ্রগতি শিক্ষক পিতার হাত ধরেই। তাঁর নিজের জবানীতে, 'সংস্কৃতই আমার প্রথম প্রেম'। অথচ ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে প্রতিটি বিষয়ে প্রথম হয়ে সংস্কৃতে অনার্স পাবার পরও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়তে গিয়ে খ্রিস্টান কন্যার সামনে বাধা উপস্থিত হয়। এই বাধা এক সময়ে এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে তিনি সিদ্ধান্ত নেন ইংরেজীতে এম.এ পড়ার। ইংরেজীতে এম এ পাশ করার পরও সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ পাশ করেন এই কৃতি ছাত্রী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রক্ষণশীলতা মনে পড়িয়ে দেয় সুকুমারীর পূর্ববর্তী আর এক জ্ঞানসাধকের কথা যিনি অব্রাহ্মণ ও ভিন্নধর্মী (মুসলমান) হওয়ার জন্য সংস্কৃতে এম.এ পড়ার সুযোগ না পাওয়ার ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব পড়তে বাধ্য হন—ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সুকুমারী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান হিসাবে অবসর নেন ১৯৮৬ সালে। অন্যদিকে ডঃ শহীদল্লাহ ১৯২১সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত

বিভাগে প্রভাষক এবং পরবর্তী কালে ১৯৩৭ পর্যন্ত প্রধান অধ্যাপক হন. বাংলা বিভাগ পথক হয়ে গেলে তার অধ্যক্ষ ও প্রধান হিসাবে ১৯৪৪ সালে অবসর নেন।

সুকুমারী বিদ্যালয় জীবন থেকেই অসাধারণ দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিচয় রাখেন। তিনি কিশোর বয়সেই স্কুলে বল নাচের ক্লাস বয়কট করেন এই যুক্তিতে যে যদি শিখতেই হয় উদয়শঙ্করের নৃত্যশৈলী শিখব, বল নৃত্য কেন? তাতো আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নয়। খ্রিস্টান পরিবারের সুকুমারী দত্ত এবং হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে অমল ভট্টাচার্য নিজেদের পছন্দ অনুসারে পরস্পরকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলে নানা পারিবারিক বাধা আসতে শুরু করায় সুকুমারীর প্রবীনা ঠাকুমা বললেন, ''বাড়ীর মেয়েকে তোমরা শাড়ি গয়না পছন্দ করার স্বাধীনতা দেবে অথচ তার জীবনসঙ্গী পছন্দের অধিকার দেবে না? এ কেমন করে হয়।'' এই পারিবারিক ঐতিহ্য থেকেই মানুষকে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দান করার শিক্ষা সুকুমারী লালন করেন অন্তরের গভীরে। তাই ভীষণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও হয়ে উঠতে পারেন প্রতিবাদী।

এবারে সুকুমারী ভট্টাচার্যের সারস্বত অবদান সম্পর্কে অবশ্যই সামান্য আলোচনা অপরিহার্য। ভারতচিন্তার ক্ষেত্রে সুকুমারীর অনন্যতা প্রথমেই আমাদের নজরে পড়ে। গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত রচিত 'স্বদেশীয় ভারতবিদ্যা সাধক' প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ একখানি গ্রন্থ যার মধ্যে একশতজন ভারত-বিদ্যা-সাধকের জ্ঞানচর্চা ও অবদানের বিবরণ প্রদত্ত। এই বিবরণে সুকুমারী বর্জিত। জানিনা, এর কারন সুকুমারীর দ্বারা 'ভারত চিন্তার বিকল্পবয়ান' উপস্থাপন কীনা! নানা অসুস্থতা সত্ত্বেও হাসিমুখে গবেষণার অনুসন্ধিৎসায় আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আপসহীন যুক্তিবাদী, ঋজু ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির নির্ভীক এবং প্রতিবাদী সুকুমারী ভট্টাচার্য। ১৯৭০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তাঁর বৌদ্ধিকচর্চার অনন্যতা, গভীরতা এবং এক বিকল্প ইতিহাস ও সমাজ ভাবনার ধারাবাহিক উপস্থাপনা আমাদের অবশ্যই দায়বদ্ধ করে— আলোচ্য স্মারকগ্রন্থটি তারই ইংগিতবহ।

সুকুমারী ভট্টাচার্য রচিত গ্রন্থাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি যে তাঁর রচিত ২৬টি বই এর মধ্যে ১৭ টি অতীত অন্বেষণ মূলক এবং ৯টি সমকাল ভাবনা-কেন্দ্রিক। একটি জার্মান ভাষায় লেখা ছাড়া স্মারকগ্রন্থটি দ্বিভাষিক বাংলায় ৩০ টি এবং ইংরেজীতে ২৩টি প্রবন্ধের সংকলন। এই দুই ভাষার প্রবন্ধগুলিকেই দুটি করে অংশে ভাগ করা হয়েছে—অতীত ভাবনা ও সমকাল ভাবনা। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই দুটি ভাগই অনুসরণ করব। দেশ এবং বিদেশের অর্ধ-শতাধিক যে সকল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ এই উদ্যোগে তাঁদের রচনাসহ সামিল হয়েছেন সে সকল অঞ্চল হল এগুলি আসাম, কলকাতা, শান্তিনিকেতন, নতুন দিল্লী, হরিয়ানা, পুনে, আলিগড়, ত্রিপুরা, জার্মানী, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নেদারল্যাণ্ড এবং বাংলাদেশের রাজসাহী ও চট্টগ্রাম। সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই যে স্মারকগ্রন্থটি একটি আন্তর্জাতিক প্রয়াস হয়ে উঠেছে। আমরা কিছ বাছাই প্রবন্ধের বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টামাত্র করতে পারি।

প্রথমেই আমরা অতীত অন্বেষণ সম্পর্কিত বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধাবলীর মধ্যে থেকে নির্বাচিত কিছু প্রবন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি। শুরুতেই আমরা জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারততত্ত্ব বিষয়ক প্রখ্যাত অধ্যাপক ক্লাস মাইলিউসের প্রবন্ধটির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পতনের ফলে

ভারততত্ত্বচর্চার উপরে যে আঘাত এসেছে এবং নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে তার বিরোধিতা করে অধ্যাপক ক্লাস এই বিশেষ চর্চাক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই রচনাটিই সমগ্র স্মারক গ্রন্থের মূল সুরটি বেঁধে দিয়েছে।

এরপরই উল্লেখযোগ্য একগুচ্ছ প্রবন্ধ যেগুলির ভাবনা-বৃত্ত সুকুমারীদির অতীত চিন্তার সুনিশ্চিত ইংগিতবহ। এগুলি হল তপোধীর ভট্টাচার্যের ''ভারতচিন্তার বিকল্প বয়ান'' প্রীতিকুমার মিত্রের ভিন্নমত ও ভাব-বিদ্রোহ প্রাচীন ভারতীয় দৃশ্যপট, ''বিজয়া গোস্বামীর'' সংস্কৃত সাহিত্যে মানবিকতা বোধ, ''রমেন্দ্রনাথ ঘোষের ''চার্বাক জড়দর্শন'' রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'চার্বাক দর্শনের স্বরূপ' সনৎকমার সাহার 'উপনিষদে ইহজাগতিক বার্তা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, আয়ান ম্যাবেট রচিত Early Indian Buddhism and the Supernatural এবং চার্লস মাশামৌদ রচিত The Sacrificing Animal। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের উপর দুটি প্রবন্ধ থাকলে সুকুমারীর ভাব-বিশ্ব আরো ভালভাবে প্রতিফলিত হত। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে ভারতীয় ঐতিহ্যের ব্রাহ্মন্যবাদী ব্যাখার বিপরীতে লোকায়ত বস্তুবাদী ঐতিহ্যের ধারাটিকে লেখাগুলি তুলে ধরেছে—

এরপরে আমার আলোচনা করতে পারি একগুচ্ছ বাংলা ও ইংরেজি ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীর যেগুলিতে যুগ ও জীবনের নানা দিকের উপর প্রভুত আলোকপাত ঘটেছে ঃ অমলেন্দু দে রচিত 'মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় রেনেসাঁ' দীপক ভট্টাচার্যের 'মৌনীনগর' রণবীর চক্রবর্তী প্রাচীন ভারতের বণিকসম্প্রদায়'' শাহানারা হোসেনের ''প্রাচীন যুগে বাঙ্গালী নারীর জীবন, সংস্কৃত সঙ্কলন সাহিত্যে প্রাপ্ত কিছ খণ্ড চিত্র. সজিত কমার আচার্যের ''অন্বেষায় কলিঙ্গ ঃ যুগে যুগে দেশে দেশে'' সরজভানের 'The Indus Sarasvati Civilization concept' শিরীন রত্নাগারের. 'An Archeologist Looks at Tradition' রামশরণ শর্মার. 'From Jana to Janapadanivesa' এবং রোমিলা থাপারের, 'The Vamsavali From Chamba : Refleetions of a Historical Tradition' প্রতিটি প্রবন্ধই সুলিখিত এবং সকমারীর ভাব-জগতের পরিপ্রেক্ষিতটিকে কয়েকটি প্রবন্ধে সুন্দরভাবে বর্ণিত করা হয়েছে।

সুকুমারী সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটক মৃচ্ছকটিক-এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। তাঁর স্মারকগ্রন্থে এই ধারাতেই করা হয়েছে তিনটি বই-এর বিশ্লেষণ ও সমালোচনা ঃ রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মিনী নির্মাণ ও পাঠভেদ'. জ্যোতিষ নাথ রচিত 'Rajaratnakara or ocean of Kings : A Sanskrit Historical work of Tripura'এবং নীলাঞ্জনা শিকদার দত্ত প্রণীত 'The Rgveda an earliest specimen of oral poetry'।

সামগ্রিকভাবে অতীত অন্বেষণের ক্ষেত্রে ইতিহাস. সাহিত্য এবং ব্যতিক্রমী ভাবনা-চিন্তার পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে।

এবারে আমরা সমকালীন বিষয়গুলির দিকে নজর দিতে পারি। এই বিষয়গুলি সম্পর্কিত রচনাবলী অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

অর্থনীতি-বিষয়ক দুটি প্রবন্ধে ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়া থেকে সাম্প্রতিক বিশ্বায়ন পর্যন্ত পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশে উপনিবেশবাদ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাকে অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন উৎসা পট্টনায়ক ও অমিয় কুমার বাগচী। আলোচ্য স্মারকগ্রন্থটি যাঁর সম্মাননার জন্য অত্যন্ত সপরিকল্পিতভাবে গ্রন্থিত ''তিনি নিজের পরিচয় দেন একজন দায়বদ্ধ মার্ক্সবাদী (Committed marxist) বলে'' কেন মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছেন? প্রশ্নের উত্তরে বলেন

'একজন মানবতাবাদী তবে কোন মতবাদকে গ্রহণ করবে?' মার্ক্স-কথিত সমাজবদলের ভাবনার মধ্যেই রয়েছে সবচেয়ে শক্তিশালী বিপ্লবী শক্তির বার্তা। যে-কাঁটা মাড়িয়ে রক্তাক্ত হয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সেই পথের বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধ দুটিতে তুলে ধরা হয়েছে। উৎসা পট্টনায়ক তাঁর প্রবন্ধটির নাম দিয়েছেন 'ঔপনিবেশিক সম্পদের হস্তান্তর ও ব্রিটেনের শিল্পায়ন 'বিনা পয়সার ভোজ'।

তাঁর প্রবন্ধ থেকে একটি অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টি অনেকখানি পরিষ্কার হবে, 'ভিত্তি বৎসর ১৭৭০-এ এশিয় ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে যে পরিমাণ সম্পদ ব্রিটেনে হস্তান্তরিত হয়েছে তা ব্রিটেনের মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৩ ভাগ। ১৮০১ সালে তা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৬ শতাংশ এবং ১৮১১ সাল পর্যন্ত এই হারেই ঔপনিবেশিক সম্পদ হস্তান্তরিত হয়েছে এবং ১৮২১ সাল নাগাদ তা কিছুটা কমে হয়েছে শতকরা ৫.২ ভাগ। ব্রিটেনে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে মূলধন গঠনের পরিমাণ ছিল মোট জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত হিসাবে এরকম ১৭৭০-এ ৫ শতাংশ, ১৮০১-এ ৭ শতাংশ, ১৮১১-এ ৭ শতাংশ, এবং ১৮২১-এ তা ছিল ৮ শতাংশ (ডীন ও হাবাকুক, ১৯৬৩ এবং ডীন ও কোল ১৯৫৯, ২৬১-৬৩)। এই অনুসন্ধান থেকে আমরা জানতে পারি যে ঔপনিবেশিক সম্পদের হস্তান্তরের পরিমান ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অনুপাত হিসেবে ছিল এরকম ঃ ১৭৭০-এ ৬৫.৪ শতাংশ ১৮০১ এ ৮৬.৪ শতাংশ, ১৮৮১১ এ ৯৫.৯ শতাংশএবং ১৮২১-এ তা ছিল ৬৫.৩ শতাংশ।'' উপনিবেশের সম্পদ হস্তান্তর দ্বারা যে পরিপুষ্ট হয়েছে ব্রিটিশ শিল্পায়ন তা স্বতঃ ই বোঝা যায় এই মন্তব্যটি থেকে 'সংশয়াতীতভাবে ১৭৮০ থেকে ১৮৬০ এর মধ্যে ব্রিটেন বিনিপয়সার ভোজ খেয়ে গেছে। বিনিয়োগের উপর স্বাভাবিক প্রতিদানের হার ছিল বাৎসরিক ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। অথচ ব্রিটেন এর থেকেও অতিরিক্ত ১২ শতাংশের মতো বেশি প্রতিদিন পেয়ে গেছে কোনও খরচ না করেই।'' (ডি. ম্যাক ব্রুমকি, ১৯৮১)।'

অর্থনীতি বিষয়ক দ্বিতীয় যে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা হল অমিয় কুমার বাগচির 'বিপন্ন গণতন্ত্র'। বিরক্তিকর হলেও কিছু দীর্ঘ উদ্ধৃতি ছাড়া প্রবন্ধটির সারমর্ম তুলে ধরা সম্ভব নয় ঃ প্রথমত, ''আজ দেশে দেশে গণতন্ত্র দুই দিক থেকেই বিপন্ন, এবং এই বিপন্নতার মূল কারণ ধনী শ্রেণী এবং ধনী দেশের শাসকশ্রেণীর লাগাম ছাড়া লোভ ও হিংস্রতার বিজয়াভিযান।'' এর খেসারত দিতে হয়েছে ভিয়েতনাম যুদ্ধে দশ থেকে কুড়ি লক্ষ লোকের প্রাণহানিতে, ইন্দোনেসিয়ার দশ লক্ষ লোকের গণহত্যায়, ২০০২-২০০৩ সালে মুক্ত ও সন্ত্রাসমুক্ত দনিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য আফগানিস্তান ও ইরাকে লক্ষ লক্ষ অশ্বেতকায় এশিয়াবাসীর জীবনান্তে।

''গণতন্ত্রে দ্বিতীয় প্রবল শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমান দুনিয়ার বিশাল বিশাল কোম্পানি (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুজাতিক কোম্পানি) নিয়ন্ত্রিত বিনোদন ও সংবাদমাধ্যম।'' আমাদের দেশে প্রধান প্রধান বাজারী কাগজ এবং টিভি চ্যানেল সারা পৃথিবীতে ধনীর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে বিশাল আন্দোলন চলছে তার অধিকাংশ খবরই দেয় না।''

''গণতন্ত্রের তৃতীয় শত্রু হলো পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে ধনিক শ্রেণীর তাণ্ডব এবং গণতন্ত্র বিকাশের বিরুদ্ধে তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ। এর খুব স্পষ্ট উদাহরণ হলো আমাদের দেশ, মার্কিন যক্তরাষ্ট এবং ইতালি।'' বিশেষত আমাদের দেশ ভারতবর্ষে গণতন্ত্রবিকতিকরণের তিনটি

প্রধান শক্তি হলো সাম্রাজ্যবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ওপর ধনীশ্রেণীর দৃঢ়মুষ্ঠি দখল। এই তিনটি প্রক্রিয়াই আবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিজুলি করে গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি হরণ করে। এর প্রকৃষ্ট এবং মানবিকভাবে সর্বনিকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় গুজরাটে গণতন্ত্র বিকৃতির ইতিহাসে।'' রাষ্ট্রযন্ত্রকে যদিচ্ছাক্রমে ব্যবহার করে নারী, শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক লোক নির্বিশেষে সকলের উপর দাঙ্গাবাজরা যে রকম নারকীয় অত্যাচার করেছে ভারতবর্ষের দাঙ্গার ইতিহাসে তা অভ্তপূর্ব ঘটনা।''

''গণতন্ত্র-হন্তাদের সঙ্গে ধনী-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন গলায় গলায় জড়িয়ে আছে। যে ধনী নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ধনীর সম্পদ সারাক্ষণ বাড়িয়ে চলেছে এবং গরিবকে ক্রমাগত সমাজের উচ্ছিষ্টের মতো আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করছে তার সবগুলি প্রবাহ বিষবর্ষী।'' বিশ্বের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, নোয়ামচমস্কী এবং নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী জন সালস্টনের ভাষায় হচ্ছে বড় কোম্পানী চালিত সামন্ততন্ত্র (corporate fendalism)। ''আর তার শীর্ষে আছে মহাশক্তিধর মার্কিন যুক্ররাষ্ট্র ও তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলির সৈন্য সামন্ত, বিশাল নৌবহর চোরাগোপ্তা আক্রমণকারী কয়েক হাজার উড়ো জাহাজ এবং সর্বধ্বংসী অস্ত্রসম্ভার। আর আছে এই সামন্ত্রতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রনকে যৌক্তিকতা দেওয়ার জন্যে সশস্ত্র অপরাধী, সন্ত্রাসবাদী ও ভাড়াটে গুণ্ডার বাহিনী। নব্যসামন্ত্রতান্ত্রিক কোম্পানি-চালিত ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে নতুনভাবে লড়তে হবে বিশ্বের সাধারণ মানুষকে।''

সুকুমারী ভট্টাচার্য স্মারকগ্রন্থে সমকাল ভাবনার ক্ষেত্রে সমাজ-সম্পর্কিত বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত ছয়টি রচনার মধ্যে আমরা কয়েকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাব। অবশ্য অন্যান্যগুলিও যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজ-বিষয়ক নিবন্ধাবলীর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মইনুল হাসান রচিত 'ভারতীয় মুসলমান সমাজে সংস্কার আন্দোলনের ধারা'। মইনুল সমস্যাটিকে সঠিক জায়গায় ধরেছেন বলে মনে করি। ''সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫০ টি ছোটবড় দেশ আছে যাদের রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম অথবা মুসলমানরা সংখ্যাধিক্য। ২০০২ সালে ইউএনডিপি কেবলমাত্র মুসলিম দেশগুলির উপর মানন্নয়ন রিপোর্ট তৈরি করেছিল। চিত্রটি অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রায় কোনো দেশে গণতান্ত্রিক সরকার নেই।'' ''যে-ধর্ম শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে বার বার সেই ধর্মের নামে পরিচালিত রাষ্ট্রগুলিতে উপেক্ষিত হচ্ছে আধুনিক শিক্ষা।'' মুসলিম সমাজকেই তার জবাব দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের রাস্তায় যেতে হবে। যে শিক্ষা একদিন আলো দেখিয়েছে তাকে গ্রহণ করতে হবে মনেপ্রাণে। তাকে ভিত্তি করেই, মর্য্যাদা দিয়েই আধুনিক হয়ে উঠতে হবে। এ অস্বীকার করার উপায় নেই আর বিকল্পও নেই।'' মইনুল সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের শিক্ষামূলক সংস্কার আন্দোলনের কয়েকজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের ভাবনা-চিন্তা ও কার্যকলাপকে তুলে ধরেছেন। তাঁরা হলেন ঃ স্যার সৈয়দ আহমদ, বদরুদ্দিন তায়েবজি, হাজী শরিয়তউল্লাহ, মৌলভী নিসার আলী বা তীতুমীর, সৈয়দ আমির আলি, নবাব আব্দুল লতিফ, দেলওয়ার হোসেন আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম এবং কাজী আব্দুল ওদুদ। মইনুল এই নামগুলির সঙ্গে যদি আরো তিনটি নাম যুক্ত করতেন তবে খুবই ভাল লাগত ঃ নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ও রেজাউল করিম। মইনুলকে ধন্যবাদ জানাই এই সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে হাসান ইউসেফি এস্কে ভারির এগারটি প্রস্তাবকে উপস্থাপিত করার জন্য।

সমাজ সম্পর্কে এর পরের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধটি হল মালিনী ভট্টাচার্য রচিত 'বৈধব্য ও

বৈরাগ্য ঃ বৃন্দাবন পর্বের নারী'। আবাল্য পারিবারিক সূত্রে এই সকল নারীদের দেখা-শোনা ও জানার মধ্যে দিয়ে তাঁদের দুরবস্থা ও অসহায়তার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সতীদাহ-রদ বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, বিবাহে সম্মতির বয়স সম্পর্কিত বিতর্কের সঙ্গে বৃন্দাবনের এই বিধবাদের অবস্থাকে মেলাতে পারতাম না। মালিনীর লেখাটি আমার মর্মকে স্পর্শ করেছে। এই বৃন্দাবনবাসী বাঙালী বিধবাদের সংখ্যা দশ হাজার অথবা তার কমবেশী যাই হোক না তা যে তাঁদের 'সামাজিক মৃত্যু'র সমতুল্য এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁদের বৃন্দাবনে যাওয়ার প্রধান কারণ আপাতদৃষ্টিতে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হলেও তা যে মূলত ছিল সম্পত্তি, জমিজায়গা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবের মত কারণের সঙ্গে যক্ত তা সন্দেহাতীত।

সমাজ বিষয়ক আর একটি গুরুত্বপর্ণ প্রবন্ধ হল 'Vijaya Ramaswamy' রচিত 'Gender Issues in Early South Indian History'। সঙ্গতভাবেই নিবন্ধকার বলেছেন যে ভারতের ইতিহাস ১৯৭০ সাল পর্যন্তই ছিল মূলত পুরুষদের ইতিহাস— মূলত এই ইতিহাস ছিল রাজনীতি ও যুদ্ধের ইতিহাস এবং দু একটি ক্ষেত্রে রাণী রুদ্রাম্মা বা রাণী চিন্নামার মত রাজকীয় মহিলাদের ইতিহাস। অবস্থাটা বোঝা যায় তামিল সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে এন সুব্রামানিয়ানের বর্ণনা থেকে ঃ নারীদের অবস্থা যে শোচনীয় এবং অত্যাচারিত ছিল তা বলার পর মন্তব্য করেছেন, ''সেই সমাজে অস্পৃশ্যরা যেমন নিজেদের হীন অবস্থা সম্পর্কে চেতনাহীন, সেই রকম নারীদের মধ্যেও তাঁদের অধীনতা সম্পর্কে অনুভূতির একান্ত অভাব।'' তামিলনাড়ুর সঙ্গম সাহিত্যের যুগ থেকে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত শিশুকন্যারা পরিবারে স্বাগতই ছিল তাদের সম্পর্কে কোন নেতিবাচক মনোভাব নজরে পড়ে না। ঐ সময়ের পরে দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতায়ন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং ব্রহ্মণ্য প্রাধান্য প্রভাবিত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শিশুপুত্রের চাহিদা এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়-সুপুত্রা ঃ কুলদীপকা এই মনোভাবের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তামিল, তেলেগু এবং কন্নড় প্রবাদ প্রবচন থেকেও এই মনোভাবের পরিচয় মেলে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে মেয়েরা অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠে এই কারণে যে তারা পিতামাতার খরচপত্র এবং সমস্যা অসুবিধা আশংকার কারণ হয়ে ওঠে। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হত না এবং শিক্ষা না থাকায় তাদের শূদ্রদের মতই জপতপের অধিকার ছিল না। মেয়েদের জীবনে কেন্দ্রীয় জায়গা দখল করে ছিল কর্পূ বা সতীত্ব। দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা না করে তাদের বিক্রয় বিনিময় বা যে কোনওভাবে ব্যবহার করা যেত। নারীরা ছিল পারিবারিক গণ্ডীতে আবদ্ধ, জনগণ সম্পর্কিত ক্ষেত্রে তাদের স্থান ছিল না। অবশ্যই সামাজিক কাঠামোর নিম্নতর পর্যায়গুলিতে নারী কৃষি, সেচ, গোপালন, কুটির শিল্পের মত অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে কর্মরত ছিল। কিন্তু শ্রম নিরত মহিলাদের দেখা মিললেও সম্পত্তির ক্ষেত্রে তারা বৈষম্য ভোগ করত— মেয়েরা পিতৃসম্পত্তির অংশের উত্তরাধিকার পেত কিন্তু সে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়-বন্টনের অধিকার তাদের ছিল না। নারীদের এই ঐতিহাসিক সমীক্ষা থেকে দেখা যায় তাদের দটিমাত্র প্রধান ভমিকা ছিল— পরিবারে গহবধূ অথবা বাহিরের জগতে গণিকা।

রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত ছয়টি নিবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Aijaz Ahmad রচিত The Making of India এবং জয়া হাসানের ভারত-পাকিস্তানের শান্তি সম্পর্কিত প্রবন্ধটি। সংস্কৃতি-বিষয়ক যে সাতটি নিবন্ধ স্মারকগ্রন্থটিতে অন্তর্ভক্ত হয়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য Irfan Habib রচিত 'In Defence of orientalism- Critical Note on Edward Said.'

আব্দুল মোমেন রচিত 'সঙ্গীত ও শ্রেয়োনীতি' এবং ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাষাতাত্ত্বিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'। ইরফান হাবিব এডওয়ার্ড সৈদ-এর সমালোচনা প্রসঙ্গ দেখিয়েছেন সৈদ কীভাবে মার্কস-এর ভূমিকাকে খাটো করে দেখিয়েছেন অথচ মার্কসের ভাবনা-চিন্তা অন্তর্ভুক্ত করে কীভাবে নতুনতর এর Orientalism রূপ কল্পনা করা যায়। আবুল মোমেন 'সঙ্গীত ও শ্রেয়োনীতি' সম্পর্কিত বিতর্কিত বিষয়টির উপর সুন্দর আলোকপাত করেছেন একটি উদাহরণকে সামনে রেখে— বাংলাদেশের পাহারপুরে অবস্থিত সোমপুর বিহারের একটি পোড়ামাটির চিত্রে দেখা যায় কুয়োয় জল তুলতে এসে এক মা স্বর্গীয় সঙ্গীতের সরে আচ্ছন্ন হয়ে কলসির বদলে ছেলের গলায় দড়ি বাঁধতে উদ্যত হয়েছেন।

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ও তাঁর সহযোগীরা রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের বিশ্লেষণ করেছেন কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে ভাষাবিজ্ঞান ও সংখ্যাতত্ত্বের সূত্র অনুসারে। উদ্দেশ, বিভিন্ন তথ্যের সমাহারে রবীন্দ্ররচনার রীতিবিচার। এই পদ্ধতির অনুসরণে দেখা যায় ''আমাদের এতকাল ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথ তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন বেশি মাত্রায়; কিন্তু কম্পিউটার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তৎভব অর্থাৎ বাংলা শব্দের সংখ্যার উপরেই কবি জোর দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী। অর্থাৎ বাংলা শব্দ যাতে কালে মহীরুহ হয়ে উঠতে পারে এই ছিল কবির আকাঙ্খা।'' এতক্ষণে আমরা ''অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য সম্পাদনা গ্রন্থটির একটি সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে তাঁর অতীতবর্তমান ভবিষ্যৎব্যাপী ভাবনাবিশ্বের একটি রূপরেখার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। তাই লেখাটি শেষকরার পূর্বে তাঁর নির্ভিক স্বাধীনচিত্ততার দুটি সময়োপযোগী মন্তব্য যোগ না করে পারছি না ঃ (এক) তসলিমা নাসরিন মানুষ জন্তু নন, জন্তুর মতো তাঁকে খাঁচায় পুরে রাখার অধিকার কর্তৃপক্ষকে কে দিল? এই গভীর একাকিত্ব ও মর্মান্তিক যন্ত্রণা যাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের প্রাপ্য শাস্তিকে দেবে? তবে শুনুন দণ্ডদাতারা, তসলিমা বাঙালি লেখিকা, বাংলাদেশ তাকে ঠাঁই দেয়নি বলে পশ্চিমবঙ্গও কি সৎমায়ের মতো তাঁকে তাড়িয়ে দেবে? না, আমরা দাবি করছি সর্বান্তকরণে যে তিনি যেন দ্রুত ভারতীয় নাগরিকত্ব পান এবং মাথা উঁচু করে তাঁর প্রিয় স্থান কলকাতায় বাস করতে আমন্ত্রিত হন। যাবজ্জীবনের জন্য যেন এ আমন্ত্রণ হয়।'' (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮)

দুই) ন'মাস আগে ছত্তিশগড়ে চিকিৎসারত এক ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ... তাঁকে ধরা হল কেন? তিনি মাওবাদী রোগীদের চিকিৎসা করছিলেন ছত্রিশগড়ে। পুলিশ না হয় জানেনা কর্তৃপক্ষও কি জানে না যে ডাক্তারি তিনি পাওয়ার আগে একটা প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করতে হয় প্রাচীন গ্রীক ডাক্তারের নামে, যাঁর নাম Hippocrates Oath। তাতে বলা আছে, ডাক্তারের কাছে রোগীর একটিই পরিচয়—সে রোগী। তার আর কোনও পরিচয় ডাক্তার গ্রাহ্য করবে না। এক্ষেত্রে ডাক্তার বিনায়ক সেনের কি ওই শপথ ভেঙে রোগীকে প্রত্যাখ্যান করা চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে উচিৎ কর্ম হত, না রাষ্ট্রনীতির কাছে ন্যায়সঙ্গত আচরণ হত? অন্যায়টি দীর্ঘকালের, তবু বিবেচক সুস্থমনস্ক সব মানুষের সব মানুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা দাবি করছি, অবিলম্বে ডাক্তারটিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে রাষ্ট্রিক অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। ...

উপরে যে স্মারক গ্রন্থটির আংশিক সমালোচনা ও বিশ্লেষণ আমরা রাখলাম তার সুপরিকল্পিত, সুনির্বাচিত-বিষয়-ভিত্তিক, এবং সদর্থেই আন্তর্জাতিক নিবন্ধাবলীর সংগ্রহ, বিন্যাস ও গ্রন্থরূপায়নের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই গ্রন্থটির সম্পাদকমণ্ডলীকে। এক বিরল ব্যক্তিত্বের

নারীর প্রতি এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন দল-মত-নির্বিশেষে প্রশংসাযোগ্য—এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে সামান্যমাত্র এই সযোগ লাভে কতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। বিশ্বাস করি এই গ্রন্থটি বিশেষার্থে একটি দষ্প্রাপ্য গ্রন্থই।

রাষ্ট্রিক আইনে কোনও বিধান নেই গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আট-ন'মাস কারারুদ্ধ করে রাখা। মাওবাদীদের চিঠি ডাক্তারের কাছে পাওয়া গেলেও প্রথম মাওবাদীরা বেআইনি সংস্থা নয়, দ্বিতীয়ত সেই ভিত্তিতে বিচার হতে পারত।

আটকে রাখাটা ঘোরতর বেআইনি, নিঃসম্বল গরিব মানুষকে দাতব্য চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করাও ঘোরতর অপরাধ।... ডাক্তারকে ডাক্তারি করতে না দেওয়া বেআইনি। তার বিচার কে করবে? তার সাজা কে দেবে?" (দৈনিক স্টেটসম্যান, ২/৩/২০০৮, প: ৫)

বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক পত্রিকা

বিজ্ঞান ভাবনা

দপ্তর

৬৫ এক্সিবিশন বাগান রোড, গোরাবাজার, বহরমপর মর্শিদাবাদ

অঙ্গাঙ্গি

সম্পাদক: কুণালকান্তি সিংহ

দপ্তর : কান্দি, মর্শিদাবাদ

বিন্দ বিসর্গ

দপ্তর :

কষ্ণসায়র সাউথ, গোলপকর, নতনগঞ্জ, বর্ধমান-৭১৩১০২

বই দষ্প্রাপ্য এবং তার বঙ্কিমচন্দ্র-কত সমালোচনাও

অমিত্রসদন ভট্টাচার্য

হাজার হাজার অযুত-অযুত ছাপা বইয়ের মধ্যে কোনো কোনো বইয়ের নাম কখনো কখনো কালের গর্ভে বিলীন না হয়ে গিয়ে যে সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় একটুখানি স্থান পেয়ে যায় তার জন্য সবসময় যে কৃতিত্ব গ্রন্থ বা গ্রন্থাকারেরই— তা নাও হতে পারে। কোনো কোনো বই কালের ইতিহাসে সমালোচকের সমালোচনার জন্য বেঁচে যায়— সে সমালোচনা অনুকূল প্রতিকূল যা-ই হোক না। কোনো একটি বই যদি বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা করেন বা রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করেন— তো সে সমালোচনা তেমন অনুকূল না হলেও কিংবা প্রতিকূল হলেও সাহিত্যের ইতিহাসে সেই গ্রন্থ ও তার লেখক একটা স্থান পেয়েই যান। আর বিখ্যাত মানুষদের সেই সব সমালোচনাই যদি আমরা আমাদের অনবধানতায় হারিয়ে ফেলি তাহলে সমালোচিত বইয়ের কথাটি আর কারই বা মনে পড়বে?

এই কথাগুলি কেন বললাম, পরে বলব। তার আগে ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন কবি এবং তাঁর প্রণীত কাব্যের নাম উল্লেখ করি। কবির নাম গঙ্গাচরণ সরকার। কাব্যের নাম 'ঋতুবর্ণন'। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উনিশ শতকের 'কবি যশঃপ্রার্থী' কবিদের নামের ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত তালিকায় আলোচ্য কবি ও তাঁর রচিত কাব্যের নাম প্রকাশকাল সহ (চঁচুড়া ১৮৭৪) উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে কবি স্মরিত হয়েছেন শুধু এইটুকু। স্বতন্ত্র প্রবন্ধকারে বঙ্কিমচন্দ্র এই বইয়ের দীর্ঘ সমালোচনা না শিখলে এই বইয়ের নামটাও হয়তো আমরা হারিয়ে ফেলতাম। বঙ্কিম তাঁর 'বঙ্গদর্শন' মাসিকপত্রে ১২৮২ বৈশাখ (১৮৭৫ খ্রি) সংখ্যায় ২১ থেকে ২৫ পৃষ্ঠায় 'ঋতুবর্ণন' এই শিরোনামে একটা মস্ত বড়ো রিভিয়্যু লেখেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম এইভাবে পাঁচ ছয়টি কাব্যগ্রন্থের স্বতন্ত্র আর্টিকেল রিভিয়্যু লিখেছিলেন।

পুরাতন বঙ্গদর্শন পত্রিকার ফাইল থেকে 'ঋতুবর্ণন' সমালোচনা-নিবন্ধটি পড়েছিলাম। সেইসূত্রে ওই বইটার নাম আমার জানা ছিল। হঠাৎ কলেজস্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকানে দেখি ঋতুবর্ণন। মূল মলাটে বাঁধানো বই। সংগ্রহ করতে বিলম্ব করি না। বঙ্কিম যে 'ঋতবর্ণন' সমালোচনা করেছিলেন সেই 'ঋতুবর্ণন'।

বঙ্গদর্শন দুটি একটি বাদে বঙ্কিমের সব লেখাই ছিল অস্বাক্ষরিত। 'ঋতুবর্ণন' সমালোচনাটি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কোনো বইতেই সংকলন করে যান নি: এই অবস্থায় কী করে প্রমাণ হয় ওই সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত?

গঙ্গাচরণের ছেলে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ছিলেন বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকে নিয়মিত লেখক, গদ্যরচয়িতা-প্রবন্ধকার। 'পিতাপত্র' শীর্ষক স্মতিকথায় অক্ষয়চন্দ্র জানিয়েছেন বঙ্গদর্শনে ঋতবর্ণন

কাব্যটির সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত।

গঙ্গাচরণ নিজেও বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ সুহৃদ ছিলেন। দীর্ঘকাল সরকারী চাকরি করে সাবজজ হয়েছিলেন। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে তিনি পনেরো বছরের বড়ো ছিলেন বয়সে।

একালের পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সমালোচনার অংশবিশেষের সঙ্গে মাত্র পরিচিত ছিলেন। কারণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁদের প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনাবলীর 'বিবিধ' খণ্ডে 'সাময়িকপত্রে প্রকাশিত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত' পর্যায়ে 'ঋতুবর্ণন' সমালোচনার প্রথম এক চতুর্থাংশ মাত্র সংকলন করেন, সমগ্র অংশ নয়। এবং সমালোচনা শেষে বঙ্গদর্শনের মাসকাল বছরের উল্লেখের পর পৃষ্ঠার উল্লেখস্থলে লেখেন 'পৃ: ২১-২২'। সুদীর্ঘ কাল পাঠকবর্গ (একালে কজন পাঠকই বা মূল বঙ্গদর্শন পত্রিকা দেখেছেন) মনে করেছেন ২১-২২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সমগ্র সমালোচনাই ছাপা হয়েছে; ২৩-২৫ পাতাতেও যে সমালোচনার দীর্ঘ অবশিষ্ঠ অংশ রয়ে গেল পাঠক তা রচনাবলী থেকে কোনোভাবেই জানতে পারেনি। পরবর্তী কালে সাহিত্য পরিষদের অনুসরণে যে-সব বঙ্কিম রচনাবলী ছাপা হয়েছে তাতে সর্বত্রই ওই খণ্ডিত সমালোচনা পৃ ২১-২২ উল্লেখসহ ছাপা হয়েছে— একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। অবশেষে ১৯৭৫ সালে আমরা 'বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সাহিত্য সমালোচনা ঃ দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ' গ্রন্থে (সারস্বত লাইব্রেরি) বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সমগ্র সমালোচনাটি (বঙ্গদর্শন ১২৮২ বৈশাখ, পৃ ২১-২৫) পুরাতন পত্রিকার পাতা থেকে সংগ্রহ করে ছাপাই। বঙ্কিমের সমালোচনা বঙ্কিম-রচনাবলীতে সবটা সংকলিত না হওয়ায় 'ঋতুবর্ণন' বইটির প্রতি কৌতুহল প্রথম থেকেই যথেষ্ট ছিল। সেই পরাতন দষ্প্রাপ্য না-দেখা বইটা শেষ পর্যন্ত নিজে সংগ্রহ করতে পারায় বড়ো আনন্দ পেয়েছি।

বইটা পড়ে মনে হল বঙ্কিমের রিভিয়্যু যথাযথ। এইসব সাহিত্যসাধকদের সংকল্প হল ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেও সমালোচনায় অকারণ প্রশংসা করব না, শত্রু হলেও মিথ্যা নিন্দা করব না। এই সব সমালোচনা আজও আমাদের আদর্শ মডেল সমালোচনার মতো পড়া উচিত, চর্চা করা উচিত। সমালোচক এবং লেখকের সম্পর্ক কতটা নিকট ছিল তা 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধ থেকেই জানতে পারা যাবে (দ্রঃ বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী)। কিন্তু সেই সম্পর্ক সমালোচনার উপর কোনো দাগ ফেলতে পারে নি— কী আশ্চর্য বিশ্বাসযোগ্য বিশ্বস্ত সমালোচনা!

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার শুরু এই রকম ভাবে ঃ

'কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য; বর্ণন ও শোধন।' যে কাব্যের উদ্দেশ্য 'শোধন' তার কবি 'সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন— সৌন্দর্যের অতিপ্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতিপ্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। ... যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, যাহার উদ্দেশ্য কেবল যথা দৃষ্টাং তথা লিখিতং তাহাকেই আমরা বর্ণন বলিয়াছি।' বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শোধনের উদাহরণ হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' আর বর্ণনের উদাহরণ গঙ্গাচরণের 'ঋতুবর্ণন'। শেষোক্ত কাব্যে 'প্রকৃতির সংশোধন উদ্দিষ্ট নহে— প্রকৃত বর্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ্য জগতের আলোকচিত্র ইহার উদ্দেশ্য। উভয়েই কৃতকার্য, উভয়েই সুকবি কিন্তু প্রভেদও অতি স্পষ্ট।' বঙ্কিচন্দ্র উভয় বই থেকে, বিশেষত সমালোচ্য বই থেকে নানা অংশ উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্য পাঠককে সহজ করে বোঝাতে চেয়েছেন। বর্ণন কাব্যের কবিরূপে গঙ্গাচরণের সঙ্গে ইংরেজ কবি জর্জ ক্রীবের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তবে গঙ্গাচরণ যে শোধন কাব্যেও সম্পর্ণ 'অপটু নহেন' তারও 'কিঞ্চিৎ' নিদর্শন কাব্য থেকে উদ্ধৃত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'আমরা তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। তাঁহাকে আমরা উচ্চ শ্রেণীর কবি বলিব না— না বলিলেও তিনি আমাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহার ন্যায় কৃতবিদ্য এবং মার্জিতরুচি লেখক কখনই আপনার রচনার দোষগুণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইবে না। তবে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাঁহার কবিত্ব আছে এবং তাঁহার কবিতা প্রীতিপ্রদ বটে।'

বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধের শেষে এসে বলেছেন, 'পরামর্শ স্বরূপ ইহাও বলিতে হয় যে, ভবিষ্যৎ সংস্করণে ঋতুবর্ণনের কোনো কোনো অংশ বাদ দিলে ভালো হয়। উদাহরণ— ইক্ষুরস বর্ণনা ইত্যাদি।' অতঃপর ষোলো ছত্র উদ্ধত ঃ 'অনলেতে চড়াইয়া সেই রস জাল দিয়া .... কত লোক হয় অনুগত।'

আমার হাতে যে বইটি আছে তা 'ঋতুবর্ণন' এর প্রথম সংস্করণ নয়। গঙ্গাচরণের জীবৎকালে (১৮২৩-১৮৮৮) এই বইয়ের আর কোনো সংস্করণে হয় নি; আর বঙ্কিমের লেখা ওই রিভিয়্যু বঙ্গদর্শনে প্রকাশের পর ওই বই লেখক আর দ্বিতীয়বার প্রকাশের কথা ভাববেন বলেও মনে হয় না।

আমার সংগৃহীত 'ঋতুবর্ণন/কবিতাবলী ও গীতাবলী/ গঙ্গাচরণ সরকার'। বইয়ের প্রারম্ভে 'নিবেদন' শিরোনামে একটি গ্রন্থপরিচয় লিখেছেন পুত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার। শেষে নিবেদকের নামের বাম পাশে মুদ্রিত 'কদমতলা', চুঁচুড়া/আশ্বিন,১৩২০।' নিবেদন এর প্রথম কয়েকটি ছত্র ঃ 'এই গ্রন্থে পিতৃদেব-কৃত চারটি ঋতুর বর্ণনা আছে, কতকগুলি কবিতা অছে এবং কয়েকটি গান আছে। পিতা জীবিত থাকিতে, প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে, বসন্ত ও নিদাঘমাত্র একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থ আমাকেই উৎসর্গীকৃত করা হয়।' এই নিবেদন-এ অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকৃত সমালোচনাটি উদ্ধৃত করেন। সেই সূত্রে লেখেন 'বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবু ঋতুবর্ণনের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমরা তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাঁহার কবিত্ব প্রীতিপ্রদ।' এইবার সেই সমালোচনা উদ্ধত করিব। এই সমালোচনা নিজগুনে উদ্ধার পাইবার যোগ্য।''

লক্ষ্য করবার বিষয়, অক্ষয় সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সমালোচনার শেষের বেশ কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করেন নি। সেখানে গঙ্গাচরণের প্রশংসা অপ্রশংসা উভয়ই ছিল। অক্ষয় সরকার এই অংশের মধ্যে থেকে কেবল অনুকূল বাক্যটাই—সমালোচনাটি উদ্ধৃত করার পূর্বে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নভাবে মুদ্রিত করেন। 'বঙ্কিমবাবুর সমালোচনা' শিরোনামে সমালোচনাটি যেভাবে ২ থেকে ৯ পাতায় উদ্ধৃত করেন, তাতে বাহ্যত মনে হবে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সমগ্র সমালোচনাটাই অক্ষয়চন্দ্র উদ্ধৃত করেছেন; কিন্তু বস্তুত তা ঘটে নি।

অর্থাৎ বঙ্কিমের লেখা ঋতুবর্ণন কাব্যের সমগ্র সমালোচনাটি না-পাওয়া যাচ্ছে বঙ্কিম-রচনাবলীতে এবং সেই সঙ্গে না-পাওয়া গেল অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উদ্ধৃতিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচনার শেষে গঙ্গাচরণকে তাঁর কাব্য থেকে কোনো কোনো অংশ বাদ দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন— তার মধ্যে আছে ইক্ষুরস বর্ণনা অংশ। যেহেতু গঙ্গাচরণের জীবৎকালে ঋতুবর্ণন আর পুনর্মুদ্রিত হয়নি তাই ওই অংশ বাদ দেওয়া বা না দেওয়ার আর কোনো প্রশ্ন ওঠে না। প্রথম মুদ্রণ প্রকাশের চল্লিশ বৎসর পর বইটি 'ঋতুবর্ণন/ কবিতাবলী ও গীতাবলী' শিরোনামে আবার যখন ছাপানো হয়, তখন দেখি ইক্ষুরস সেখানেও আগের মতই বিতরিত হয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র নিজে সম্পাদক ছিলেন— 'সাধারণী' 'নবজীবন' এসব পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছেন এবং

অনেকগুলি গ্রন্থ তিনি লিখেছেন সম্পাদনা করেছেন। তাই সম্পাদনার বিদ্যা ও কৌশল তাঁর অজানা ছিল না। এবং তারই নিদর্শন পাই বঙ্কিমের লেখা সমালোচনাটি উদ্ধৃত করার সময় শেষাংশের ইক্ষুরস-প্রসঙ্গটি পরিত্যাগ করার মধ্যে।

আমরা যে বইটি হাতে নিয়ে কাজ করছি তাতে দেখছি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'নিবেদন' ১-১১ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। পৃষ্ঠা ১২ ফাঁকা। সূচি পুনরায় ১-২ পৃষ্ঠায়। তারপরে (পৃঃ৩) হাফটাইটেল; বড়ো হরফে মুদ্রিত ঋতুবর্ণণ। পরের পৃষ্ঠা (পৃঃ ৪) ফাঁকা। তার পরের পৃষ্ঠা (পৃঃ ৫) 'ঋতুবর্ণনের উৎসর্গপত্র', এবং তার পিছনের পৃষ্ঠা (পৃঃ ৬) ফাঁকা। অতঃপর নতন ১ পষ্ঠা থেকে বই শুরু। মদ্রিত শেষ পৃষ্ঠা ৩১৯। পিছনের পৃষ্ঠা (পৃঃ ৩২০) সাদা।

এই দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সূচিপত্রটি উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল। 'ঋতুবর্ণন ঃ উৎসর্গপত্র, মঙ্গ লাচরণ-১, বসন্ত-৫, নিদাঘ-৫১, বর্ষা-১১৪, শরৎ-১৪৫; কবিতাবলী ঃ ব্রিটেনিয়া-সমীপে ইণ্ডিয়া— ১৬৯, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহন— ২১৩, কাঁকশিয়ালি ঘাটের বটবৃক্ষ— ২২২, ধরমচাঁদকি চেনাচুর- ২৩২, নবজীবনের গান— ২৩৮, শিব-বিবাহ (পাঁচালি)— ২৪১; গীতাবলী ঃ ব্রহ্মসঙ্গীত— ৩০৭, হরিগুণ গান— ৩০৯, কালীকীর্তন— ৩১০, আগমনী— ৩১৪, টপ্পা— ৩১৬, যদ্ধে পরাজিত শুম্ভের নিবেদন— ৩১৭।

প্রসঙ্গত বলা যায়, যে-বছর ঋতুবর্ণন প্রকাশিত হয় সেই ১৮৭৪-এই পুত্র অক্ষয়চন্দ্রের প্রথম বই-কবিতা পুস্তক 'শিক্ষানবিশের পদ্য' মুদ্রিত হয়েছিল। ১২৮১ ভাদ্রে বই বেরলো, আর আশ্বিনের বঙ্গদর্শনে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' বিভাগে ওই পুস্তকের সমালোচনা ছাপা হল। ইতিমধ্যে বঙ্গদর্শনের পাতায় অক্ষয় সরকারের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি বঙ্গ দর্শনের নিয়মিত লেখকই হোন বা বন্ধুপুত্রই হোন— বই ভালো না হলে বঙ্গদর্শনের প্রশংসা মেলা কঠিন। 'শিক্ষানবিশের পদ্য' প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনের মন্তব্য, 'অক্ষয়বাবু গদ্যে যাদৃশ অদ্ভুত শক্তিশালী পদ্যে সেরূপ নহেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব শিক্ষানবিশের পদ্য, তাঁহার ক্ষমতার উপযুক্ত পরিচয় নহে।' এই রিভিয়্য ছাপা হবার আট মাস পর গঙ্গাচরণের বইয়ের সমালোচনা ছাপা হয়েছিল।

মনে-মনে গঙ্গাচরণের ইচ্ছা ছিল বইটি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করার; কিন্তু সাহস পান নি। তাই শেষ পর্যন্ত 'প্রাণোপম প্রিয় পুত্র অক্ষয়চন্দ্র'কে উৎসর্গ করে লেখেন, 'তুমি জান, আমাকে রাজকার্যনিবন্ধন সময়ে সময়ে বিরল-বান্ধব স্থানে অবস্থান করিতে হইয়াছিল; সেই সেই স্থানে অবকাশকাল কথাঞ্চিৎ সুখে যাপনার্থ পদ্য রচনা করিতে চেষ্টা করিতাম; সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ এই ঋতুবর্ণন গ্রন্থখানি হইয়াছে। গ্রন্থখানি সামান্য, এজন্য কোনো বড়ো লোককে উৎসর্গ না করিয়া, ইহা তোমাকেই অর্পণ করিলাম। তুমি সন্তান, পিতৃদত্ত সম্পত্তি ভালো হউক বা মন্দ হউক, তোমাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতেই হইবে।' উৎসর্গপত্রের তারিখ অগ্রহায়ণ ১২৮১।

পিতাকে যে পত্র ভোলেন নি— গঙ্গাচরণের মত্য পরে ঋতবর্ণনের পনঃপ্রকাশ তারই প্রমাণ।

বক্তব্য : ধর্জটিপ্রসাদ মখোপাধ্যায়

বিপ্লব মাজী

যৌবনে এ-বইটি আমার প্রিয় বইগুলির একটি ছিল: ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর বক্তব্য। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ প্রকাশিত হয়েছিল। দাম ছিল ১০ টাকা। প্রচ্ছদ: পূর্ণেন্দু পত্রী। ১৯৫৭-এ বের হলেও বইটি আমি কিনেছিলাম ছয়ের দশকে। বইটি ধূর্জটিপ্রসাদ স্ত্রী ছায়া দেবীকে উৎসর্গ করেন। বর্তমান প্রজন্ম ধূর্জটিপ্রসাদ সম্পর্কে কতটা জানেন? কতটুকু জানেন? এ-প্রশ্ন উঠতে পারে। শুধু এটুকু বলাই বোধহয় যথেষ্ট রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, পূর্বাশা ও পরিচয় গোষ্ঠীর কাছে একজন গদ্য লেখক, সাহিত্য ও সংগীত সমালোচক হিসেবে তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যে বিরল প্রজাতির একজন লেখক। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। বক্তব্য বইটির মুখবন্ধ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ আলিগড়-এ বসে লিখেছেন। সেখানে উল্লেখ করেছেন 'গত পঁচিশ বছরের মধ্যে এগুলি লেখা' অর্থাৎ বক্তব্য-এ সংকলিত গদ্যগুলি তিনি ১৯৩২ থেকে ১৯৫৭-র মধ্যে নানা পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য *পূর্বাশা* ও *পরিচয়* পত্রিকা। এ দুটি পত্রিকাতেই বেশি লেখা। এ ছাড়া *ক্রান্তি, মাসিক বসুমতী, শারদীয়া দেশ, শারদীয়া যুগান্তর, লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাবে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে বক্তৃতা ২৮ এপ্রিল ১৯৪০, প্রগতি লেখক সংঘ ১৩৪৯, সাহিত্যপত্র, বনফুল, উত্তরা, সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা* পত্রিকাগুলির উল্লেখ এ জন্যেই করলাম ধূর্জটিপ্রসাদ এর মতো মননশীল, চিন্তা-সমৃদ্ধ লেখকের বেশিরভাগ লেখাই লিটিল ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ-এর লেখা না পড়লে বোঝা যাবে না তিনি কত বড় মাপের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে চিন্তাঋদ্ধ ব্যক্তিত্ব। বক্তব্য বইটি দুটো স্তবকে ভাগ করা। প্রথম স্তবক সমাজ-সংক্রান্ত চিন্তা নিয়ে; দ্বিতীয় স্তবক সংস্কৃতি-সংক্রান্ত চিন্তা নিয়ে। বইটির মুখবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন : 'বক্তব্যের মধ্যে তিনটি মোটা সূত্র রয়েছে। প্রথমটি ইতিহাস, এবং তারই চারপাশে গুটি কয়েক লেখা দানা বেঁধেছে। দ্বিতীয় সূত্রে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে, এবং তারই সম্পর্কে, বিশেষ করে তাঁর সংগীত ও সমাজ-চেতনা নিয়ে, কয়েকটি প্রবন্ধ গড়ে উঠেছে। শেষ সূত্রটি হল 'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা' এবং তারই সংক্রান্ত আরো কয়েকটি প্রবন্ধ। প্রথম ও তৃতীয় সূত্র কার্ল মার্কসের অজুহাতে, রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সমাজতত্ত্বকে ঘিরে। সংগীত সম্বন্ধে আমার মন্তব্য অপেক্ষাকৃত স্বাধীন।' ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মুখবন্ধের অংশবিশেষ তুলে দিলাম—পাঠক যাতে তাঁর গদ্যের আধুনিকতা সম্পর্কে সামান্য পরিচিত হন। বিগত শতাব্দীর তিন-চার-পাঁচ-এর দশকে যখন বেশিরভাগ লেখক সাধুভাষায় লিখতে অভ্যস্ত—ধূর্জটিপ্রসাদ সহজ সরল চলতি ভাষায় মননশীল বিষয় নিয়ে আড্ডার মেজাজে আলোচনা জমাতেন।

বক্তব্য-র সমাজচিন্তা স্তবকে নব্যসমাজদর্শনের ভমিকা। নব্য সমাজদর্শনের প্রতিজ্ঞা। মার্কসবাদ

ও মনুষ্যধর্ম, অতঃকিম্, ইতিহাস-১, ইতিহাস-২, ইতিহাস-৩ আছে। সংস্কৃতি চিন্তা স্তবকে রবীন্দ্রনাথ ও তুলনা, রবীন্দ্রসৃষ্টি, রবীন্দ্র-সমালোচনার পদ্ধতি, রবীন্দ্রনাথের চিত্র, রবীন্দ্র-সংগীত ও গায়ন-পদ্ধতি, রবীন্দ্রজন্মতিথি উৎসব, কবির নির্দেশ, রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি, বিশ্ব, প্রগতি, বর্তমান সাহিত্যের মূলকথা। গদ্য-কবিতা, আষাঢ়ে, সংগীত-সমালোচনা, অথঃ কাব্য-জিজ্ঞাসা, নতুন ও পুরাতন গদ্যগুলি সংকলিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় তেইশটি গদ্য। এ-গদ্য সমূহ পাঠ করলে যেকোন পাঠক বুঝতে পারবেন ধর্জটিপ্রসাদ মখোপাধ্যায়ের ভাবনা-চিন্তা ধ্রুপদী-সংগীতের মতোই উচ্চ-স্বরগ্রামে বাঁধা।

বক্তব্য-র গদ্যগুলি নিয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনায় যাবো না, কারণ ২৫৭ পৃষ্ঠার ২৩টি গদ্য নিয়ে বিচারবিশ্লেষণ ও আলোচনার পরিসর এখানে নেই। বইটি সম্পর্কে তথাই প্রধান। কিন্তু পাঠকের খিদে নিবত্তির জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ধর্জটিপ্রসাদ-এর ভাবনা চিন্তার কিছ উদ্ধতি দেব:

১.

> নব্য ভারতের জন্য বহু জিনিসের প্রয়োজন। নব নব দ্রব্যসম্ভারের কথাই সকলের মুখে; এটা স্বাভাবিক ও সামাজিক। নতুন আগ্রহ, এমনকি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখও পাওয়া যায়; তবে অল্প পরিমাণে। ইংরেজ তাড়াবার পর কি হবে আমরা ভাবিনি, এবং যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁরা চিন্তা ও যুক্তি অপেক্ষা জাতির অনাহত, অকৃত্রিম, আদিম, সহজাত শক্তির ওপরই আস্থাবান ছিলেন বলে জনসাধারণের সামনে ভবিষ্যৎ ভারতের কোনো রূপ ফোটাতে পারেননি; এটাও স্বাভাবিক কিন্তু অ-সামাজিক। মহাত্মাজীর কল্পিত রূপ ক্ষণিকের জন্য জনসাধারণের না হলেও জনকয়েকের মানসপটে ভেসে উঠেছিল নিশ্চয়, কিন্তু কালো মেঘ পাশেই ছিল, দিল তাকে ঢেকে। সে রূপ সম্বন্ধে একাধিক বই, দেশে সেই অনুযায়ী একাধিক অনুষ্ঠান, তার দ্বারা প্রভাবান্বিত একাধিক সজ্জন, মহাজন থাকলেও নানা কারণে দেশ তার প্রতি আগ্রহহীন। ভক্তির জোরে ভোট দেওয়া কি সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু দেশ যতদিন পর্যন্ত কর্তাভজার দলে পরিণত না হচ্ছে ততদিন নাম জপের কার্যকারিতা কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। বামমার্গী দলের প্রয়োজন এইখানে। এখনও কিন্তু দেশে বামমার্গের প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তার বহর কম। আমরা অনেকেই মার্কসের ও বিদেশী মার্কসবাদীদের লেখার সঙ্গে পরিচিত; আমরা কত রকমেরই না সোশিয়ালিস্ট দল তৈরি করছি, মাতৃভাষায় প্রবন্ধ লিখছি, পড়ছি; কিন্তু যে পরিমাণে চিন্তার ক্ষিপ্রতা, গভীরতা ও বিশ্লেষণ থাকলে ভারতের গণপ্রধান রূপ জনগণের সামনে প্রকট হতে পারে, তার নিদর্শন মেলা দুর্ঘট। কমিউনিজম ঘেঁষা সাহিত্যের প্রচার সব চেয়ে বেশী; কিন্তু সেখানে নতুন তথ্য কিছু থাকলেও তার তত্ত্বকথা ভক্তির আড়ম্বরে চাপা ও তার বিচার যান্ত্রিক। সোশিয়ালিস্ট সাহিত্যের প্রচার আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রচনা ভিন্ন অন্যত্র চিন্তার সাক্ষাৎ বেশী পাওয়া যাচ্ছে না। এই সুযোগেই গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্রের জন্মলাভ। এটা হয়তো সুবিধাবাদের লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। গান্ধীবাদীরা বুঝেছেন যে সমাজতন্ত্র বা সোশিয়ালিজম কথাটি গ্রহণ করাই সঙ্গত; এবং কংগ্রেসের প্রতি বহু রুষ্ট, অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা দেখছেন যে, কার্যকলাপে কংগ্রেস-নীতি থেকে দূরে সরে এলেও গান্ধীবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মূলগত পার্থক্যের বিচার হয়নি, কেবল নাম নিয়ে কাডাকাডি চলছে। তাই মনে হয় নব্য ভারতের পক্ষে সব চেয়ে

বেশী প্রয়োজন নব্য সমাজদর্শন।

(নব্য সমাজদর্শনের ভূমিকা—১/পূর্বাশা/বৈশাখ ১৩৫৫)

২০০৭- এ পৌঁছে বর্তমান ভারতের পরিস্থিতি দেখে ধূর্জটিপ্রসাদ-এর ভবিষ্যদবাণীর সঙ্গে সুশীল সমাজ এক হবেন। এই গদ্যে তিনি তখনই বলে দেন 'স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থত্যাগের আবেদন দুর্বল হয়েছে কে না জানে!' এবং এই নিবন্ধেই তিনি বলেন: 'জাতি বা নেশন থেকেই ন্যাশনাল স্টেট, কিন্তু সেটা তৈরী হবার সঙ্গেই ব্যক্তিকে সংযত করার ক্রিয়া চলে, কেন না সমগ্রের ধর্মই তাই। ব্যক্তি আপত্তি জানায় স্বাধীনতার নাম নিয়ে আর রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করবার প্রয়াসের দ্বারা। এই জন্যই আমরা গণতন্ত্রের ধারণাটির প্রচলনের অব্যবহিত পূর্বেই মার্কেন্টিলিজম্-এর সাক্ষাৎ পাই। সেই সুরেরই রেশ জনগণের আওয়াজ ভেদ করে আজকালকার সরকারী হুঙ্কারে পরিণত হয়েছে। রিনেসাঁ-হ্যম্যানিজ্মের এই দশা।' *নব্য সমাজদর্শনের প্রতিজ্ঞায় ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন : ভারতীসমাজ যতই ভেঙে পড়ুক না কেন সেটি এখনও অসংলগ্ন, ব্যক্তিকণার জঞ্জাল হয়নি। তার আচার-ব্যবহারে, তার সমাজরীতিতে, তার দৃষ্টিভঙ্গীতে এখনও এমন কটি মানব প্রত্যয়ের আভাস মেলে যেটি ব্যক্তিত্বের অপেক্ষা পরুষ-তত্ত্বের অনকল।*

২.

> মার্কসবাদের বিপক্ষে একটা বড় ও সাধারণ আপত্তি এই যে, তাতে ব্যক্তির কোনো স্থান নেই। অনেকেই এই আপত্তির জবাব দিয়েছেন। জবাবের মধ্যে দুটি কথা সকলেই অবশ্য মানতে বাধ্য ঃ (১) ধনতন্ত্রের দাপটে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ব্যক্তিত্ব খুইয়েছে, অতএব ধনতন্ত্র না গেলে ব্যক্তিত্ব স্ফূরণের অবকাশই মিলবে না; এবং (২) এই সমাজে মাত্র যে জনকয়েকের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুবিধা ঘটেছে, তাদের জীবনেও সেই সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার হয়নি। প্রমাণস্বরূপ প্রত্যেক শ্রমিক 'ব্যাবিট্'-শ্রেণীর অপরিণত জীবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ ছাড়া, অন্য স্তরের লোকেরাও প্রাণ ধারণে এত ব্যস্ত, আর্থিক শোষণে এতই ক্লান্ত যে ব্যক্তিত্ব তাদের পক্ষে গল্প মাত্র, ফুটিয়ে তোলা তো দূরের কথা। শিক্ষক-সম্প্রদায়, আর্টিস্ট, বৈজ্ঞানিক, প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীরই আজ এই দশা। তবু এই ধরনের উত্তর নঙর্থক, কারণ ধনতন্ত্রে মানষ ছোট হচ্ছে মানলেই মার্কস-পছন্দ সমাজে মনষ্যত্ব ফটবেই ফটবে বলা যায় না।

(মার্কসবাদ ও মনুষ্যধর্ম / পূর্বাশা/ বৈশাখ ১৩৫৪)

ভারতীয় সমাজে মার্কসবাদের প্রয়োগ ও পদ্ধতি নিয়ে এ-নিবন্ধে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা আজো প্রাসঙ্গিক। আমরা আজ চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি ভারতের কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী) কিভাবে ধীরে ধীরে পঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। কর্পোরেট হাউস নির্ভর পার্টি হয়ে পডছে।

৩.

> দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে আমাদের নেতৃবৃন্দ নানা কথা বললেও একই মনোভাব দেখিয়েছেন। সে মনোভাব বিশেষ নয়, ইংরেজ-অধীন ভারতবর্ষের ব্যাপারেও তাই দেখেছি, অর্থাৎ trusteeship এই কথাটি যে পৃথিবীর কত সর্বনাশ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এদেশেও তার নমুনা দেখা দিয়েছে। মহাত্মাজী পুঁজিওয়ালাদের, রাজন্যবর্গকে সকলকেই অধস্তন শ্রেণীর জিম্মাদার (trustee) হতে বলেন; জওহরলালও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

(constitutional) চান। এটা উনবিংশ শতাব্দীতে হয়তো চলতো-তাও পরোপরি, এখন তো একেবারে অচল। আমাদের এখন জনগণের সরকার (peoples government) চাইতে হবে। এবং সেই সঙ্গে জনগণও ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর ক্রীডনক যাতে না হয় তার উপরও নজর রাখতে হবে।

(অতঃকিম্ / পূর্বাশা / শ্রাবণ ১৩৫৪)

সাম্প্রতিক সময়ে উন্নয়ন, উচ্ছেদ, শিল্পায়ন ও 'সেজ' নিয়ে সারাদেশ জুড়ে যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ধূর্জটিপ্রসাদের বক্তব্য দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয়। ভারতের তথাকথিত কমিউনিস্টরা মহাত্মাজী-র পথেই হাঁটতে শুরু করেছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ-এর ইতিহাস-১-২-৩ পাঠ করলে যে-কোন পাঠক মানব ইতিহাসের ধর্ম ও গতি প্রকৃতি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাবেন। তাঁর মতে ঃ 'সমাজ ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এক-বাঁচা ও আরো ভালো করে বাঁচা।' আজ থেকে ৭৪/৭৫ বছর আগেই তিনি বলেছেন ঃ 'ধনতন্ত্রের সবচেয়ে উন্নত অবস্থা হল একচেটিয়া ব্যবসা এবং তার বাজার হল উপনিবেশ।' একথা আজও কত সত্য তা তো আমরা সাম্প্রতিক সময়ের বিশ্বায়নের নামে নয়া উপনিবেশবাদীদের চরিত্র দেখে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি। ধনতন্ত্রের বর্তমান চেহারা ধূর্জটিপ্রসাদ দেখেননি, কিন্তু তাঁর ইতিহাস পাঠ থেকে লেখেন ঔপনিবেশিকদের সম্পর্কে : 'স্টেট হল ভগবান, জাতিগত ঐক্য হল সবচেয়ে শক্ত বাঁধন। এটাই হল জার্মান লিবারেলিজ্‌ম। এর সঙ্গে ইংরেজ লিবারেলিজমের পার্থক্য অনেক। জার্মান উদারপন্থার মূলকথা স্টেট ও সমাজগত ঐক্য, ইংরেজী উদারপন্থার মূলকথা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। পার্থক্যের কারণও সুস্পষ্ট; ইংলণ্ডের উদারপন্থা উপনিবেশ ও অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যের ফল, জার্মানীর হল উপনিবেশ না থাকার প্রতিক্রিয়া। এজন্যই বোধ হয় ইংরেজী চিন্তাধারায় লালিত ভারতবাসী কমিউনিজম, ফ্যাসিজম, নাৎসি আন্দোলন ঠিক বুঝতে পারে না। জার্মানীতে উদার মতের প্রচারক ছিলেন হেগেল, ফিখটে প্রভৃতি দার্শনিক, লিস্টের মত অর্থনীতিবিদ এবং আমনের মত জাতিতত্ত্ববিদ। সকলেই ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করতেন, অর্থাৎ ঐতিহাসিক পারম্পর্য ও বৈশিষ্ট্যকে গণ্য করেই তাঁরা নিজেদের মত প্রস্তুত করছিলেন। ইতালীতে এ মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন সিসমণ্ডী। লিস্ট দেখলেন, বিশ্বজনীন অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য সব দেশের পক্ষে সব সময় উপযুক্ত নয়। কোনো দেশ কৃষিপ্রধান, কোনো দেশ ব্যবসা ও বাণিজ্যপ্রধান, অতএব অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা চাই। লিস্ট বলেন, ইকনমিক নিয়মাবলী ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক নয়। প্রত্যেক দেশের অবস্থা প্রায় সমান সমান হলে তবেই তাদের মধ্যে অবাধ ব্যবসা চলতে পারে।

(ইতিহাস-২ পরিচয় / শ্রাবণ ১৩৪০)

আমরা আজ যে মুক্তবাজার অর্থনীতি ও লিবারেলিজম-এর কথা বলি ধূর্জটিপ্রসাদ তা নিয়ে অনেক আগেই আলোচনা করেছেন। শুধু তাই না, তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন ভারতবাসীর বংশগত ঐক্য একটা আছে আর তা হল 'ধনতান্ত্রিক উদারপন্থাকে সমর্থন করা।' আমাদের অর্থনীতিবিদরা সবসময় যে ধনীদেরই স্বার্থ দেখেন তা তখনই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মতে ঃ 'সামাজিক ইতিহাসের দিকে কেউ দেখলেন না। ভারতবাসীর এই মানসিক কাঠামোতে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যকে বসানো হয়েছে। সেজন্য বিজ্ঞানের ডাক্তার হয়েও গোঁড়ামি, বিজ্ঞান-শিক্ষার বদলে শিল্প-শিক্ষার চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।' ধূর্জটিপ্রসাদ মনে করেন; ইতিহাসের প্রত্যয়গুলি রক্তমাংসের: তারা মর্ত, সংহত, দেশ ও কাজ-নির্দিষ্ট ব্যবহার থেকে অ-মক্ত। প্রত্যয়

মাত্রই মনঃকল্পিত, তবু যেন ঐতিহাসিক প্রত্যয়গুলি এই ব্যবহারিক জগতেরই অধিবাসী। তিনি মনে করেন : মুনাফার আশাই শ্রেণীকে চালিত করে। শ্রেণী সেজন্য কখনই লোকশ্রেয়কে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। ইতিহাসের উপলব্ধি থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ মনে করেন ঃ শ্রেণীতে বিভক্ত হবার জন্যই মানুষ মানুষ হতে পারছে না। সংস্কৃতি চিন্তা বিভাগে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের 'সজ্ঞান শ্রদ্ধা' অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর বিচার, বিশ্লেষণ, তর্ক ও উপলব্ধি বাংলা গদ্য সাহিত্যে নতুন-চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। রবীন্দ্র বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের তা রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাঁর গদ্যগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়। ধূর্জটিপ্রসাদ মনে করেন ঃ 'রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাজী আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের রথী-মহারথীদের সঙ্গে তুলনা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। তাঁর মতে পরাশ্রয় আত্মার পরাজয় ঘোষণা করে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে অদ্বিতীয়।'' তাঁর অদ্বিতীয়ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে তাঁর বিশেষত্বের জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজন। সেটার অভাবে তলনা হয়ে ওঠে ভাবোচ্ছাস এবং দাসমনোভাবের চরম নিদর্শন।'

(রবীন্দ্রনাথ ও তুলনা / উত্তরা / আশ্বিন ১৩৪৮)

রবীন্দ্র সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর অভিমত ঃ রবীন্দ্রনাথের ভাঁড়ার ছিল দুটি—সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণ, অর্থাৎ, গ্রামের জনগণের জীবনধারা ও আদর্শের ক্ষেত্রে সনাতন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধর্মের পূর্বেকার সরল ঔপনিষদিক শান্তি, শিব ও অদ্বৈত প্রত্যয়ে ও অজেয় আত্মায় প্রগাঢ় বিশ্বাস। দু'টি নিদর্শন যথেষ্ট হবে। (১) সমাজের আড়ষ্টতা ভাঙবার, সঙ্গীতে মুক্তিলাভের উপায়, গ্রাম্য জীবনের উদ্ধারে এবং বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তনের আশীর্বাদে। (২) কবিতার অভিব্যক্তির এক যুগে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', দ্বিতীয় যুগে 'এবার ফিরাও মোরে' ও তৃতীয় যুগে বলাকার গতিরাগ। চরম সংক্রান্তি সাধিত হল বের্গসঁর জীবনশক্তিকে উপনিষদের সাহায্যে creative unity তে পরিণত করে। জীবধর্মকে মনন এইভাবেই প্রয়োগ করে।' তিনি মনে করেন ঃ রবীন্দ্র-সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক ঘটনার মতন ভাবলে বিস্ময়ের হেতু থাকে না। রুদ্র, অবাস্তব, ভয়ঙ্কর প্রভৃতির স্থান প্রকৃতিতে আছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যেও আছে। তাঁর মতে ঃ রবীন্দ্র প্রত্যয় ভারতীয়, একান্তভাবে স্বদেশী, উপনিষদের। প্রেমকে বেদনা না ভেবে সম্পর্ণতা ও মক্তির উপায় ভাবা এই দেশেরই ভাবনা।

(রবীন্দ্র-সৃষ্টি /রবীন্দ্র-স্মৃতি / পূর্বাশায় ১৩৪৮)

রবীন্দ্র সমালোচনার পদ্ধতি, রবীন্দ্রনাথের চিত্র, রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও গায়ন পদ্ধতি নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা যে কোন পাঠককেই উদ্দীপ্ত করবে, চিন্তার খোরাক জোগাবে। রবীন্দ্র তিথি পালন সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের তির্যক মন্তব্য ঃ 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে ভক্তিই পেয়ে গেলেন, শ্রদ্ধা পেলেন না।'

ধূর্জটিপ্রসাদ মনে করেন রবীন্দ্র সঙ্গীত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেরই অংশবিশেষ। কবিতার কোনো বিশেষভাবে ছক মূর্তি দিতে গিয়ে হয়ত রাগভ্রষ্টতা ঘটেছে কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্ণসঙ্কর না। সাধারণ সভায় রবীন্দ্রসঙ্গীত নির্জীব হওয়ার কারণ রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা। ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা রবীন্দ্র সঙ্গীতের অসাধারণ specific গুণ। আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই রবীন্দ্র ভক্ত হিসেবে। কেউ রবীন্দ্রনাথ না। আমাদের কারো মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব নেই। নেই রবীন্দ্র-প্রতিভা। তা যদি থাকত আমরাও 'বিশেষকে নির্বিশেষ ও সাধারণে পরিণত করতে পারতাম।'

রবীন্দ্র জন্ম তিথি উৎসব সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের তির্যক মন্তব্য ঃ 'যে ব্যক্তি চিরজীবন না হয়, অন্ততঃ শেষ ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর দল ছাড়া হয়ে কাটালেন, যিনি দলাদলিতে দেশের সর্বনাশ হয়েছে বলে গেলেন, যিনি ব্যক্তিবিশেষকে পূজা করা মনুষ্যত্ববিকাশের অন্তরায় ভাবতেন এবং যাঁর স্থান দলের উপরে বলেই বিশ্বের ও চিরকালের, সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার বেলা তাঁকে বক্তার দলে টেনে আনার মধ্যে একটা ক্ষুদ্রতা ধরা পড়ে।'

(রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসব / মাসিক বসুমতী ১৩৫৬)

ধূর্জটিপ্রসাদের মন্তব্য ঃ 'রবীন্দ্র রচনায় ভাবজাত বিপ্লবী পরীক্ষার বহু নিদর্শন থাকলেও তার মর্মকথা ঐতিহ্যের সংযত অগ্রসৃতি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের উচ্ছ্বাস, হা-হুতাশ, অতিরঞ্জন একেবারেই অচল ও অবান্তর। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অভিমান বা সম্মানের পাত্র নন, তিনি বাঙালি, 'ভারতীবাসী, এশিয়াবাসী, এমনকি মানবের পরিমাণ, মানদণ্ড।' রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত দু-একটি পথের কথা বলতে গিয়ে তিনি লেখেন : 'প্রথমেই মনে ওঠে স্বাবলম্বন। কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, ভাষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, স্বাস্থ্য, সাজসজ্জা গৃহের উপকরণ, জাতীয় জীবনের প্রতিটি বিষয়ে তিনি আপন-আপন চেষ্টাকেই নবজাগরণের মূলমন্ত্র বলেছেন। রাজনীতিতে তখন ভিক্ষাবৃত্তি চলছিল, তিনি সে-বৃত্তিকে ত্যাগ করতে বললেন এবং এই কারণেই, তাঁর সঙ্গে বালগঙ্গাধর তিলক এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ উগ্রপন্থীদের হৃদয়ের মিল হয়। তখনকার সরকার রবীন্দ্রনাথকে 'এক্সট্রিমিস্ট' ভাবতেন এবং তাঁর পিছনে গুপ্তচর রাখতেন। কিন্তু এই আত্মসন্ধান, আত্মসাধনা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নামান্তর ছিল না। সমবেত সামাজিক প্রয়াসই তাঁর উপায় ছিল। সমাজ অর্থে তিনি হিন্দ-মসলমান বঝতেন না।

(কবির নির্দেশ। দেশ/শারদীয় ১৩৬২)

আমাদের সাম্প্রতিক চিত্তবিক্ষোভ, হতাশা ও শূন্যতাবোধে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশগুলি আমাদের সাহায্য করতে পারে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের কর্মের প্রতি নিষ্ঠা। আত্মনির্ভরতার ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাস। জনগণকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কেও ধূর্জটিপ্রসাদের বক্তব্য আমাদের চিন্তায় নতুন কিছুর উন্মেষ ঘটায়। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি নিয়ে চিত্তরঞ্জন, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-র সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতার স্মৃতি বেশ আগ্রহ উদ্দীপক। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তৃতা ভালোলাগার সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন সেখানে বলছেন, 'কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ কবি।' অন্যদিকে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দের ভাই) বলছেন : 'রবীন্দ্রনাথ প্রধানত একজন পলিটিক্যাল জীব, যিনি কবিতার মারফত আমাদের কথাগুলি বেশ গুছিয়ে সাবধানে লেখেন। একট যদি কার্ল মার্কস পডতেন মনোযোগ দিয়ে তবে রক্ষা ছিল না!'

(রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি। লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাবে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে বক্তৃতার অনুলিখন, ২৮ এপ্রিল ১৯৪০)

ধূর্জটিপ্রসাদ পলিটিক্স ও কবিতার দ্বন্দ্ব সমাধানের ওপর ভারতের সংস্কৃতি কিভাবে নির্ভর করছে তা বিশ্লেষণ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের জন্মস্থানে আজ আমরা যে 'আমরা আর ওরা'-র রাজনীতি করছি, এই 'যান্ত্রিক বনাম-মূলক' রাজনীতির চেহারা ধূর্জটিপ্রসাদের চোখে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষেও পড়েছিল। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিকতার প্রভাব কাটিয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন, আর আমরা রবীন্দ্রনাথ 'কবি না পলিটিশিয়ান?' এ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করি। অথচ কবি তো

মানুষ। মানুষ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীব। তার স্ফূরণের জন্য চলমান সমাজ ও স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রয়োজন। অন্যদিকে স্বাধীন মানুষ চাইলে কবি হতে পারেন। কবিতা উপভোগ করতে পারে। কিন্তু এ ধরনের 'অর্গ্যানিক ধারণা'-র বিপদ তা হয়ে যাবে 'ইংরেজ-দ্রোহিতার চিহ্ন'। ধূর্জটিপ্রসাদ-এর মতে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামতের মূল কথা হল এই ঃ 'পরাধীন দেশে ও আবদ্ধ সমাজে জনগণের অন্তর্নিহিত সৃষ্টির চরম বিকাশ, অর্থাৎ কাব্য-রচনা, এমনকি কাব্যোপভোগও একপ্রকার অসম্ভব।' ধূর্জটিপ্রসাদ মনে করেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ-এর মতো বিদেশি ধরতাই বুলিগুলো আমাদের মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। কারণ, 'মুনাফা বৃদ্ধির অবাধ স্বাধীনতাই হল উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিত্ববাদের প্রাথমিক প্রয়োজন। এরই নাম ইংরাজী লিবারেলিজ্‌ম।' এ প্রসঙ্গে আরো বিশদ আলোচনার পরিসর গড়ে তুলে তিনি বলেন : '১৯০৫ সালের পর থেকে দেশে যে extremism শুরু হয়, তার এক মুখ ছিল ধ্বংসের দিকে, অন্য মুখ ছিল গোঁড়ামির দিকে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ ও হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ববাদ কোনোটাই তাঁর সমাজ-ধর্মের অনুকূল ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করেন আন্দোলনের মোড় ঘোরাতে, 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', থেকে 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত বিস্তর রচনায় তার প্রমাণ পাবেন। যেটার প্রমাণ সহজে মিলবে না সেটা তাঁর কর্মের। কিন্তু যাঁরা তাঁর কর্মজীবন লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, শান্তিনিকেতনে বসবাস, জমিদারিতে সমবায়-সমিতি, পাঠশালা-হাসপাতাল খোলা, পকর কাটানো, গাছ বসানো, পল্লীসংস্কার, শ্রীনিকেতন স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্য, National Council of Education-এ যোগদান—তাঁর প্রত্যেকটি কাজের একটি গূঢ় অর্থ ছিল। সেটি হল এই—ভিক্ষার ঝুলি ফেলে দেশ যেন নিজের পায়ে দাঁড়ায়, জনগণের সমবেত শক্তি যেন জাগ্রত হয়, মিথ্যা ভান ত্যাগ করে কর্মীরা যেন প্রকৃত মাটির মানুষ হয়।'

(লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাবে ... / ২৮ এপ্রিল ১৯৪০)

ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন : রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ওসমাজতত্ত্ব ইংরেজের পলিটিক্যাল ফিলজফির কোটরে ঢোকে না। যেহেতু ইংরেজ রাজনীতিতে রাষ্ট্র আছে সেখানে স্বাধীনতা নিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব আছে। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি স্বদেশী সমাজের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সমাজতত্ত্ব অর্গ্যানিক। অধিকার সর্বস্ব না। ত্যাগ ধর্মী।

ধূর্জটিপ্রসাদ সেই ১৯৪০ এ দেখতে পেয়েছিলেন ভারতবর্ষে সামাজিকতার প্রাধান্য থাকলেও 'সেখানে ন্যাশনালিজমের নামে রাষ্ট্রদৈত্যের পূজা অহরহ চলছে।' এই ২০০৮-এ আমরা আমাদের চারপাশে এই রাষ্ট্রদৈত্য কি ধরনের সন্ত্রাস চালাচ্ছে তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। যে দৈত্য উন্নয়নের নামে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে শিল্পায়নের নামে পুঁজিপতি ও কর্পোরেট হাউসের স্বার্থ দেখছে। গরিবগুর্বো মানুষ তাদের কাছে পরিসংখ্যান। ধূর্জটিপ্রসাদ মনে করেন : রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ দেশে রাষ্ট্র-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে মাথা তোলেন। রাষ্ট্রবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ-লোভের এ-পিঠ ও-পিঠ।

প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা নিয়ে বক্তব্যে ধূর্জটিপ্রসাদ-এর মন্তব্য : 'আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনে তথ্য, ঘটনা ও মূল্যজ্ঞানের কোন যথার্থ তাগিদ নেই। যখন তা নেই তখন আঙ্গিকের কেরামতি ঝুটো মনে হয়। আগে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান আসক, তার উপর রূপ সষ্টি হোক, তবেই প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা হবে।'

(প্রগতি / প্রগতি লেখক সঙ্ঘ। ১৩৪৪)

১৯৫৭-এ বক্তব্য প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ থেকে ২০০৮ এই পঞ্চাশ বছরে আমাদের চারপাশে সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। আদর্শে ভাঙন ও মূল্যবোধেও পরিবর্তন ঘটেছে। শিল্প-সাহিত্য ও সঙ্গীতের জগতে যার অভিঘাত তীব্র ও পরিবর্তনমুখী। তবু, ধূর্জটিপ্রসাদের বিদগ্ধ সমাজ চিন্তা ও সংস্কৃতি চিন্তা আজও প্রাসঙ্গিক। তাঁর বক্তব্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতেই পারে। তাঁর অনেক তির্যক মন্তব্য আমাদের ভালো বা না ভালো লাগতেই পারে। তবু এ-বইয়ে যে আড্ডার-মেজাজ আছে, যে বৈদগ্ধ ও প্রজ্ঞার সন্নিবেশ আছে তা আমাদের প্রভাবিত করে। তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গিকে নমস্কার না জানিয়ে পারা যায় না। তাঁর চিন্তার বিশেষত্ব আমাদের মনে সম্ভ্রম জাগায়।

বক্তব্য। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড,
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯।
২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ প্রকাশিত। দাম-দশ টাকা। প্রচ্ছদ : পর্ণেন্দ পত্রী

কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে

জলসিডি

দপ্তর

১৮ ব্রজভষণ গুপ্ত রোড, খাগড়া, মর্শিদাবাদ

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

খোঁজ

সম্পাদক: নীহারুল ইসলাম

দপ্তর : কালিকলম, লালগোলা, মর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ পত্রিকা

এবং কি কে ও কেন

দপ্তর : ১১/৩, এ কে কে ব্যানার্জী রোড, বহরমপর, মর্শিদাবাদ

একটি দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা
নীরদ চন্দ্র চৌধরী সম্পাদিত 'সমসাময়িক'

সন্দীপ দত্ত

সাময়িক পত্রপত্রিকার ইতিহাসে এমন কিছু পত্রিকা আছে যা প্রকাশের পরই দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যায়, এমন কী কোনো গ্রন্থাগারেও তার হদিশ থাকে না; এমন কী সম্পাদকের কাছেও তার খোঁজ মেলে না। আজ এমনই একটি পত্রিকার কথা বলতে চাই। নীরদ সি চৌধুরী পরিচিত ব্যক্তিত্ব। পত্রিকাটি এক সময়ে সত্যজিৎ রায় খোঁজ করেছিলেন। তাবৎ গ্রন্থাগারে বা ব্যক্তিসংগ্রহে বাইশ বছর ধরে খুঁজে পত্রিকাটি পাওয়া যায়নি। বাইশ বছর বলছি এই কারণেই ১৯৮৭তে 'কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র' থেকেই নির্মাল্য আচার্য মশাই সত্যজিৎ রায়ের আকাঙ্খিত লেখাটি জেরক্স করিয়ে নেন। ওনার থেকেই জেনেছি কোনো লাইব্রেরি বা নীরদ সি চৌধরীর সংগ্রহ থেকেও তাঁরই সম্পাদিত পত্রিকাটির হদিশ মেলেনি।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদনায় 'সমসাময়িক' প্রকাশিত হয়েছিল আষাঢ় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে। দিলীপ কুমার সান্যালের পরিচালনায় ৬বি, বকুলবাগান রো ভবানীপর থেকে প্রকাশিত এই ত্রৈমাসিক পত্রটির দুটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। দুটি সংখ্যাই মূল্যবান।

নীরদচন্দ্র এর আগে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও 'নতুন পত্রিকা' নামেও একটি কাগজ যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন। 'সমসাময়িক' চারের দশকের উল্লেখযোগ্য একটি পত্রিকা। পত্রিকার সূচনায় ১০ পৃষ্ঠার দীর্ঘ 'সম্পাদকীয় আলোচনা'য় সম্পাদক পত্রিকার উদ্দেশ্য ও 'পলিসি' সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, ''নূতন সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইলে লোকের মনে উহার উদ্দেশ্য ও 'পলিসি' সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই দুই প্রসঙ্গেই আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তব রেওয়াজ অন্যায়ী জবাবদিহির মত একটা কিছু খাঁড়া করিবার চেষ্টা করিতেছি।

সাময়িক পত্র নানা উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রথম উহার লক্ষ্য হইতে পারে ব্যবসা করিয়া লাভ। আমাদের এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে এই আশা পোষণ করা বিষয়বদ্ধির নিতান্তই বিরোধী হইবে। সুতরাং এ বিষয়ে বাক্যব্যয় অনাবশ্যক।

দ্বিতীয়ত, পত্রিকা প্রকাশিত হইতে পারে, কোন বিশিষ্ট মত প্রচারের জন্য। ইহাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কারণ 'সমসাময়িক'কে কোন একটি বিশেষ মতের মখপত্র করা আমাদের অনভিপ্রেত।...''

অর্থাৎ সম্পাদকীয়কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হলো যে পত্রিকাটি হবে অব্যবসায়িক এবং স্বাধীন

মতাকাঙ্খী। আর একটি উদ্দেশ্যের কথাও সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানানো হয়েছে ঃ আর্থিক লাভ ও মত প্রকাশ ছাড়া আত্মধ্যানের আকাঙ্খাও মানুষকে পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী করিতে পারে। আত্মধ্যান মানবের একটা সুপরিচিত বৃত্তি। পত্রিকা প্রকাশ বা অন্য কোনো কার্য্যকলাপকে দর্পণের মত সম্মুখে ধরিয়া উহার ভিতরে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইবার ইচ্ছা—আমাদের মানসিক চেহারা কত সুন্দর! অপর হইতে কত স্বতন্ত্র! ইতরজন হইতে কত বিশিষ্ট! এই ধরনের কল্পনা করিবার মোহ আমাদের সকলেরই আছে। মনস্তাত্ত্বিকেরা ইহাকে ব্যাধি বলিয়া ঘোষণা করিলেও আমাদের পক্ষে এই সহজাত বৃত্তি কাটাইয়া উঠা দুরূহ। সুতরাং এ বিষয়ে একেবারে মোহমুক্ত হইবার দম্ভ করিব না। তবে ব্যক্তি বা দল হিসাবে আমাদের আত্মপ্রত্যয় ও সাহস অত্যন্ত কম, সেজন্য আমাদের পক্ষে একটা মানসিক বা শারীরিক ভঙ্গী লইয়া পাঠকের সম্মখে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় নাই।

সুরসিক মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। বাংলাভাষা সম্পর্কে কিছু প্রশ্নও তোলা হয়েছে সম্পাদকীয় কলমে। সাধুভাষা ও মৌখিক ভাষার প্রসঙ্গে ক্রিয়ারূপ ব্যবহারের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'লিখিত ভাষার ক্রিয়ারূপের স্থলে মৌখিক ভাষার ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করিলে বাংলা গদ্যের ছন্দ ও ধ্বনি এত বিভিন্ন হইয়া যায় যে, দুই নৌকায় পা দিয়া থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

... যাঁহারা মৌখিক ভাষা ব্যবহার করেন তাঁহারা যে তৎসম শব্দ কম ব্যবহার করেন বা রচনাভঙ্গীতে বেশী প্রাঞ্জল তাহা নয়, ... আসল ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে এই, সাধু ভাষার পক্ষপাতী ব্যক্তিদের নিকট মৌখিকভাষার ভঙ্গী বাচালতার সূচনা করে, তেমনই মৌখিক ভাষার অনরাগী ব্যক্তিদের নিকট সাধুভাষার ভঙ্গী সেকেলে, রক্ষণশীল, আড়ষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান হয়। ...'

এছাড়া সংস্কৃতির সংকট বিশ্বযুদ্ধ বিষয়টিও সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছে।

পত্রিকার প্রথম রচনাটি রবীন্দ্রনাথের। শেষ অভিসার কবিতা। সম্পাদক নীরদচন্দ্র চৌধুরী 'যুদ্ধের টেকনিক' প্রবন্ধে যুদ্ধরীতির নানা কৌশলের কথা আলোচনা করেছেন। দার্শনিক প্রবন্ধ লিখেছেন কালিদাস ভট্টাচার্য 'তত্ত্ববিচার'। 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচার' নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন দিলীপকুমার সান্যাল। 'সভ্যতা' সম্পর্কিত ক্লাইভ বেলের আলোচনাটি সময়ের প্রেক্ষাপটে মূল্যবান। অনুবাদক দিলীপকুমার সান্যাল। রাজনৈতিক দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন গোপাল হালদার 'বাংলার আধুনিক পলিটিক্সের নিস্ফলতা' ও ত্রিদিব চৌধুরী 'মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতবর্ষের রাজনীতি'। মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্মা তাঁর 'হাতী শিকারে অভিজ্ঞতা'র কথা লিখেছেন। এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য একটি প্রবন্ধ 'ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে'। একেলা ছদ্মনামে স্বয়ং সম্পাদক পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করেছেন। সম্ভবত এ বিষয়ে এটি বাংলা ভাষায় প্রথম আলোচনা। সত্যজিৎ রায় এই লেখাটি পড়েই পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন ১৯৪০ সালে লেখাটি প্রকাশের পর। পরবর্তীকালে এই লেখাটিরই খোঁজ করেন।

প্রথম সংখ্যায় কবিতা আছে চারটি। 'শেষ অভিসার' ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর একটি কবিতা প্রকাশ পেয়েছে 'পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে'। এছাড়া কবিতা লিখেছেন দিলীপকুমার সান্যাল, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও কানাই সামন্ত। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ভাষা পরিচয়' ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থের সমালোচনা আছে পত্রিকার শেষ ভাগে।

দ্বিতীয় ও শেষতম সংখ্যাটির প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে। দ্বিতীয় সংখ্যার সম্পাদকীয় আলোচনায় আছে বিবিধ প্রসঙ্গ। পত্রিকা পরিচালনার সমস্যা, বাংলা ভাষা প্রয়োগ, শিক্ষা পদ্ধতির

সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক, বাঙালির কালচার ও মাতৃভাষা, শিক্ষিত বাঙালির অন্তর্বিরোধ। সমসময়—দেশকাল, প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'আধুনিক ভাস্কর্যে নূতন ধারা' নামে সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছেন— মূলত ইয়োরপীয় ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রবন্ধটিতে। 'বাংলা গদ্যের কয়েকটি সমস্যা' নামে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি লিখেছেন শশাঙ্কশেখর বাগচী। ক্লাইভ বেল-এর 'সভ্যতা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'ধ্রুপদী' বিষয়ক মূল্যবান প্রবন্ধ। গোপাল হালদার-এর 'বর্তমান পলিটিকসের পথ' প্রথম সংখ্যার রচনাটিরই পরম্পরা। এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'কবি সুকুমার রায়চৌধুরী'। নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রথম সংখ্যার মতোই দ্বিতীয় সংখ্যাতে লিখেছেন যুদ্ধরীতি বিষয়ক আলোচনা, 'বর্তমান যুদ্ধে নৌবল'।

কবিতা লিখেছেন অশোককুমার মৈত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার। বর্তমান সংখ্যায় সানাই, শিলালিপি, একদা, ধাত্রীদেবতা, সন্ধানে, ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ ও ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ গ্রন্থের আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও দ্বিতীয় সংখ্যায় পৌষ ও চৈত্র সংখ্যা প্রকাশ করার কথা ঘোষিত ছিল কিন্তু আশ্বিন সংখ্যার পর কোন সংখ্যাই বেরোয়নি।

ছাইরঙা মলাটে প্রজ্জলিত প্রদীপ অলঙ্করণে রয়াল সাইজে ছাপা পত্রিকার দাম ছিল ১ টাকা। নীরদচন্দ্র চৌধরীর সম্পাদিত 'সমসাময়িক' বাংলা সাময়িকপত্রর ইতিহাস উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপর্ণ পত্রিকা।

নতনের কবিতা. নতনদের কবিতা

আর অন্য কবিতাকে সারা পথিবীর কাছে পৌঁছে দিতে এবার মহাকাশে হাজির হলো।
www.natunkabita.com

কবিতার রণভমি. কবির দঃসাহস

যোগাযোগ: ধীমান চক্রবর্তী. ৮/৪ই নেপাল ভট্টাচার্য্য প্রথম লেন. কলকাতা-২৬
কল্যাণী লাহিড়ী. ৪/২৮. নিউটাউন রোড বি-জোন. দর্গাপর-৭১৩২০৫

পর্বজন্মের ধলো খঁজে

জয়া মিত্র

পুরোন একটি ফিল্মের কথা মনে হয়, ফারেনহাইট ফোর ফিফটি ওয়ান। ফ্রমোয়া ক্রফোর ছবি শাসকেরা পুড়িয়ে দিচ্ছে সমস্ত বই। বই নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় তারা। বসার ঘরে ঘরে জেগে আছে কেবল টেলিভিশান। গৃহস্থ বাড়িতে ফিরে শব্দ করলে অন্যেরা বিরক্ত হয় সিরিয়াল ছেড়ে উঠতে হবে বলে। এদিকে কিছু মানুষ সেই বই রক্ষা করতে চায়। শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই হয়ে ওঠে এক একটি বই মহাভারত ইলিয়াড কি ডেভিড কপারফিল্ড।

বই পুরোন হয়ে যায় হারিয়ে যায় কিন্তু বিস্মৃত হয়না। সময়ের স্রোতে যে বই ডুবে যায়না তা অন্যত্র অমিল হবার পরও রয়ে যায় পাঠকের স্মৃতিতে। আবার পড়বার ইচ্ছের মধ্যে। দুষ্প্রাপ্য বইয়ের জন্য মনখারাপ হয়। সে সময় তেমন পরিচিত ছিল না কিন্তু অনেক পরে সে নতুন করে নতুন অর্থময়তায় ফিরে আসে এরকম বইয়ের সংখ্যাও অনেক। এর এক উজ্জ্বল উদাহরণ সার্ভেন্তিস এর ডন কিহোতে, যাকে ইংরেজের উদ্ধত অসভ্যতায় সমস্ত উপনিবেশ জানত ডন কুইকজোট বলে। প্রকাশের বহু বহু বছর পরে দেশের ছোট সীমানা পার করে আর্ন্তজাতিকে প্রাসঙ্গিকতা পেল এ বই। নানা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ নানান ক্ষেত্রে সেই একলা খেয়ালি যোদ্ধার প্রতিমা খুঁজে পেলেন। ডন কিহোটে হয়ে উঠলেন অতিকথা— মীথ।

কখনও কখনও 'কালের সাগর' পার করে নতুন চেহারায় ফিরে আসে কোন কোন বই আবার কোন বই হয়তো হারিয়েই যায়। 'দুষ্প্রাপ্য' ছাপ বরাবরের জন্য লেগে যায় তাদের মলাটে। হয়তো তাদের সংখ্যাই বেশি। ঠিক কেন যে অপ্রকৃত হয়ে যায় সে সব বই তার কোনো নির্দিষ্ট ফরমুলাও নেই। কখনও তা শৈলবালা ঘোষ জায়ার রচনার মতো পুরোন, মহিলা লেখকের রচনা, কখনও বা আবার সমরেশ বসুর মত সমকালীন জনপ্রিয় লেখক 'স্বনির্বাচিত' কবিতা সংকলনের কতোজন কবির সজ্জিত উজ্জ্বল চেহারা দেখি, কবিতা পড়ি। ত্রিশ বছরের এপার-ওপার তাদের অনেকের কোন বইয়ের নামও জানেনা পাঠক। প্রকাশের অনেক পর পর্যন্ত মলাটের ভিতর চুপ করে শুয়েছিল সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াই—'। অন্যদিকে প্রবল পরিচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিনেমাখ্যাত 'পদ্মানদীর মাঝি' ছাড়া অন্যান্য বই, বিশেষত তাঁর পরীক্ষামূলক ছোট ছোট অসাধারণ বইগুলি যেমন 'চতুষ্কোণ' কি 'দিবারাত্রির কাব্য' সম্পর্ণ বিস্মত হয়েছে। একাদেমিয় রচনাবলীর বাইরে অপ্রাপ্য তারা।

এতক্ষণ যে সব বইয়ের কথা হল সবই গল্প উপন্যাস। কিন্তু যে দুটি দুষ্প্রাপ্য বইয়ের কথা বলতে চাই সেগুলি অন্য বই। দুটিই নবকলেবরে ফিরে এসেছে আবার। বেশ দীর্ঘ কাল পাড়ি দিয়েই এসেছে। দু জনে দুভাবে। একজন যেন খানিকটা খিড়কি দয়োর দিয়ে নিঃশব্দে অন্যজন খোলা ফটকের পথে। দজনেই সাদরে সসম্মানে।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী পাঠকের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত 'রবিরশ্মি' নামে রবীন্দ্রসাহিত্য টীকা গ্রন্থ দুটি খণ্ডের প্রণেতা বলে। সঙ্গে সঙ্গে তখনকার অধিকাংশ সাহিত্যিকের মতই তাঁরই একটি সামাজিক দায়িত্ববোধ স্পষ্ট ছিল। স্বদেশিকতা ভাবনার সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেওয়া চারুচন্দ্র, তাঁর আরও অন্য সহচিন্তকদের সঙ্গে যতই মনে করেন ইংরেজের প্রণীত ঔপনিবেশিক শিক্ষার সঙ্গে এ দেশের বাস্তবতার কোনো নাড়ির যোগ নেই। তাই নিজের মেধা ও শিক্ষাকে হাতিয়ার করে তিনি অগ্রসর হন দেশের শিক্ষিত যুবসমাজের মনে তাদের নিজেদের দেশের কষ্টি ও জীবনধারণ বিষয়ে কিছু কিছু ধারনা গড়ে তোলবার কাজে।

ভাত অর্থাৎ চাল বা ধান ভারতের কেবল অন্যতম প্রধান খাবার নয়, কৃষি এ দেশের সংস্কৃতিগঠনেও এক বিরাট ভূমিকা রাখে। এই দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের জীবিকা কৃষি। তাঁর মনে হয়েছিল সেই কৃষিবিষয়ে কিছু ধারণা, কিছু শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না থাকলে দেশের একটি বৃহৎ বিষয় সম্পর্কে কোনো ধারণা তৈরি হবেনা ভবিষ্যত নাগরিকদের, আইনপ্রণেতাদের বুদ্ধিজীবীদের মনে, এই ভাবনা থেকে 'ভাতের কথা' নামে একটি ছোট বই লেখেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস' যার তখনকার নাম ছিল ইণ্ডিয়ান প্রেস। সেখান থেকে ১৯৪২ সালে সচিত্র শোভন সংস্করণ হিসাবে প্রকাশ পায় একটি ছোট বই 'ভাতের কথা'। উদ্দিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীরাই যেহেতু লেখকের মূল উদ্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠী তাদের মনোরঞ্জনের জন্য শুধু প্রত্যেকপৃষ্ঠায় পাতাজোড়া ছবিই নয়, সমস্ত টেক্সটটি লেখা হয়েছে ছন্দে। চাষ অর্থাৎ একেবারে সরাসরি কৃষিকর্মটি ছাড়াও তার আগে পরে যতো কাজ থাকে, যতো মানুষ যুক্ত থাকে সে সব কাজে, তার এক অনুপুঙ্খ বিবরণ আছে বইটিতে। নিঃসন্দেহে বলা যায় নিতান্ত ছোটরা কেন. বড়োরাও অনেকেই তার অনেক কিছু জানতেন না।

এই সম্পূর্ণ বইটি নিজেদের পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় ছাপিয়ে দিয়েছেন একটি ছোটদের পত্রিকা। পত্রিকাটির নাম 'ডানা'। ধান, ধানের মাঠ, কৃষিকাজকে অবহেলা করে দেশজুড়ে যে নতুন ক্ষমতাদখলের চেষ্টা চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে, সচেতনভাবে এই বইটি এঁরা পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত করেছেন। ভাতের কথার প্রথম সংস্করণের কভার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার ফ্যাকাসিমিলি ও নিচে নিচে টেক্সটটি আবার বড় অক্ষরে ছাপা। উপরন্তু লেখকের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রকাশক ও সম্পাদকের বক্তব্য, প্রাচীন বাংলার বিচিত্র একটি নাম তালিকা। প্রকাশ উপলক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংকলিত হয়েছে খুব জরুরি কিছু তথ্য। যেমন বাংলায় প্রথম ধানের নিদর্শন ৫ হাজার বছরের পুরোন; ১ বিঘা জমিতে একবার ধান চাষে মজুরি ভিত্তিতে যুক্ত থাকেন অন্তত ১৫ জন লোক; ধানচাষের ডাউনস্ট্রীম এমপ্লয়মেন্ট-এ কতোরকম জীবিকা প্রমান পায় ইত্যাদি। সমস্ত কাজটিতে ভালোবাসা ও তজ্জনিত সৌন্দর্যবোধ খুব স্পষ্ট। প্রকাশ-পত্রিকাটির মল্য ২৫ টাকা। ডানা কার্যালয়ের যোগাযোগ ০৩৩২৫৩৮-১৪৫৮।

অন্য বইটির নাম 'ভারতের গ্রামজীবন'। লেখক নির্মল কুমার বসু গান্ধিজীর শেষজীবনে সেক্রেটারিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। দীর্ঘকাল এ্যানথা লজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া-র অধ্যক্ষও ছিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের গ্রামজীবন ও তার বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করে দেখবার কার্যসচী অনযায়ী যে বিস্মত সার্ভে হয় তিনি তার নেতৃত্ব দেন। Peasant Life in India : A Study in Indian unity and diversity নামে এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। পরবর্তীকালে

১৩৬৯ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ঐ রিপোর্টের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল অপ্রাপ্য থাকবার পর 'ভারতের গ্রামজীবন' গ্রন্থাকারে মদ্রিত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশক।

বইটি হাতে নিয়ে পাঠক প্রথমেই মুহ্যমান হবেন একটি গ্রন্থণার অশেষ পরিশ্রম ও যত্ন। বিরাট এই দেশের মূল জীবনশক্তি নিহিত আছে গ্রামে। আনথ্রপলজিক্যাল সার্ভের অধ্যক্ষ নিজে গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিরীক্ষণ করেছেম মিল ও ভিন্নতার বৈশিষ্ট্যগুলি— কুটিরের চাল, লাঙ্গলের ফলা, গোরুর গাড়ির চাকা স্থান ও প্রাপ্তব্য উপাদান অনুযায়ী কিভাবে পরিবর্তনগুলি ঘটেছে, প্রত্যেক জায়গার গ্রামীণ মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও কারিগরি কুশলতা নিয়ে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হয়েছে প্রযুক্তির নতুন নতুন কৃৎকৌশল। বৃহৎ উৎপাদন চায় যান্ত্রিক প্রযুক্তি। একই বস্তুর প্রচুর পরিমানে (বা সংখ্যায়) উৎপাদন। তাতে উৎপাদকের লাভ নিশ্চয়ই হয় কিন্তু স্থানিকতার যে বৈশিষ্ট্য ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা আমাদের মত বিশাল ও বৈচিত্রশীল দেশের প্রয়োজন তার ক্ষতি হয়। এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভারতের বিশেষত্ব এবং তার শক্তির উৎস ছিল। গান্ধী স্বয়ং বারেবারে এই যথাসাধ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের কথা বলেছিলেন, যা ভারতকে ভোগবাদের শিকার হওয়া থেকে, ঔপনিবেশিক বাজার হয়ে ওঠা থেকে রক্ষা করবে। নির্মলকুমার বসুর সঙ্গে এই বিষয়ে গান্ধিজীর কথা ও ভাবনার আদানপ্রদানের প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া যায় তার লিখিত 'গান্ধী' বইয়ে। কিন্তু 'ভারতের গ্রামজীবন'— কোন মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত একটি বিবরণ যা জিজ্ঞাস পাঠকের কাজে লাগবে। এমনকি সাধারণ পাঠকও বইটিতে মুগ্ধ হবেন।

প্রত্যক্ষ গবেষণা ও পেশাদারিত্বের দিক থেকে যে বিশেষজ্ঞ ভারতের গ্রামকে দেখছেন কীভাবে তিনি ভাগ করছেন গ্রামের বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্য, তা প্রনিধান যোগ্য। 'গ্রামে একরকম লোক থাকে না। অধিকাংশ গ্রামে চাষির বাস। শিল্পপ্রধান গ্রাম ছাড়া ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামও আছে। মুসলমানদের মসজিদ ও মক্তব যুক্ত গ্রামেরও অভাব নাই। অর্থাৎ এমন গ্রাম ভারতবর্ষে নিতান্ত বিরল নহে, যেখানে প্রধানত বিদ্যার চর্চা হইয়া থাকে। আবার ব্যবসায় প্রধান গ্রামও রহিয়াছে, যেখানে সপ্তাহে একবার বা দুইবার হাট বসে, কখনও হয়তো মেলাও হয়। আমরা যেভাবে গ্রামকে দেখতে/ভাবতে শিখেছি, একটি পিণ্ডায়িত অস্তিত্ব— গ্রাম মানে যেখানে সব লোক চাষবাস করে খেতে পায়না, হদ্দমুদ্দ গরীব অশিক্ষিত অপরিষ্কার। শহরের কৃপাযোগ্য এলাকা ও লোকজন। খেয়াল করিনা যে গ্রামসভ্যতা থেকে, আমাদের দেশ থেকে বিযুক্ত, এক ঔপনিবেশিক প্রভুগোষ্ঠী আমাদের শিক্ষায় একথা ভরে দিয়েছে এবং দেশ স্বাধীন হবার পরও সেই শিক্ষার কোন পরিবর্তন হয়নি বললেই চলে। অন্তত পশ্চিমবাংলায় হয়নি। নির্মলকুমার বসু সেই বিরল বিজ্ঞানীদের একজন যিনি দেশকে দেখছেন পশ্চিমী বিদ্যার মুখস্থ শিক্ষার বাইরে থেকে। সমস্ত বইটি জুড়ে অতি যত্নে দেখাচ্ছেন ভারতবর্ষের শক্তির মূল জায়গাটি— তার প্রাকতিক বৈচিত্র ও কীভাবে সেই বৈচিত্রকে কাজে লাগিয়ে জীবনযাপন করেন এ দেশের মানুষ।

কতো যত্ন নিয়ে নির্মল বসু কাজটি করেছিলেন তার একটি অসামান্য উদাহরণ 'সঢ়কলার তৈল নিষ্কাশন যন্ত্র' অধ্যায়টি। উত্তর উড়িষ্যার সঢ়ইকলা (অধুনা বাঙালি উচ্চারণে সরাইকেল্লা)। মাত্র ওই একটি ছোট্ট অঞ্চলে যে বিভিন্নরকম দেশীয় তেলনিষ্কাশন যন্ত্র লোকেরা ব্যবহার করতেন, কাঠের পাটাতন পাথরের জাঁতা এবং ঘানি, তার বিস্তৃত বিবরণ। হাতে আঁকা

ছবিযুদ্ধ। ব্যবহারকারী গৃহস্থের নাম। কী কী বীজের তেল হয়, কেবল সর্ষে নয়-সেই বীজ তালিকার মধ্যে আছে রেড়ী, করঞ্জা, কুসুম, মহুয়াফুলের বীজ অর্থাৎ করঞ্চা শিয়ালকাঁটা (ঘায়ের ঔষধ) ভেলা (গরুর গাড়ির চাকায় দেবার সস্তা তেল) ইত্যাদি। প্রতিটি যন্ত্রের নির্মাণপদ্ধতি, চেহারা, নির্মাণের উপাদান, মাপ, যন্ত্রাংশগুলির লৌকিক নাম- সমস্তটা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কতো যত্ন ও শ্রদ্ধা থেকে কাজটিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

একই কথা ঘরের চাল অথবা গ্রামের গঠন সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি সম্পর্কে সত্য। বইটি পড়বার পর পাঠকের মনে কেবল কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়াও একটি ভাবনার উদ্রেক হবে— নিজের পরিপার্শ্বকে মন দিয়ে দেখা মানে বোঝা ও বিশ্লেষণ করার ইচ্ছা হবে। হয়ত হবে। খুব গভীর একটি বাক্যে লেখক 'মুখবন্ধ'তে নিজের লেখার প্রেরণাটি ব্যক্ত করেছেন 'যে দেশকে আমরা ভালোবাসি তাহার চেহারার সহিত আমাদের ভালোভাবে পরিচয় থাকা প্রয়োজন'। কোন কোন কাজ আমাদের সেই পরিচয় শুরু করিয়ে দেয়। হাতে আলো ধরিয়ে দেবার মত। বাকি কাজটুকু পথ দেখে নেওয়াটুকু করতে হয় নিজেদেরই।

দুষ্প্রাপ্যতার অন্ধকার থেকে এই বইকে তলে এনে, সাজিয়ে অপেক্ষাকত সলভে পাঠকের হাতে দিয়েছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

নতুন কবি ও কবিতার বাসভূমি

কবিতা ক্যাম্পাস

অলোক বিশ্বাস
৪৮/১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া, হাওড়া-৭১১১০৬
মোবাইল: ৯৪৩৩১৩০০২৩

প্রণব পাল
১৩৮/৩/১ বেনারস রোড, সালকিয়া, হাওড়া-৭১১১০৬
মোবাইল: ৯৪৩৩৪৭৮২৫০

একটি হারিয়ে যাওয়া বই এবং দজন ভুলে যাওয়া মানষ

জাহিরুল হাসান

শুধু যে বইটি দুষ্প্রাপ্য তা নয়, যাঁকে নিয়ে লেখা এবং লেখক নিজে, বিষয় ও বিষয়ী দুজনেই এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত। কোনো একবার বইমেলায় লেখক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। সুদর্শন এবং বিদ্বান মানুষ। অনেকগুলি ভাষা জানতেন। চাকরি করতেন একটি নামি ইংরেজি দৈনিকে। কিন্তু গ্রিক দেবতা ব্যাকাসের ভক্ত বলে সর্বদা অর্থকষ্টে থাকতে হত। বইমেলাতেই আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ওঁর বাড়িতে গেলে সিকিদামে অনেক বই দিয়ে দেবেন। রোজই নাকি এক বোতল দামি মদ এবং একটি নতুন বই কিনে বাড়ি ফেরেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, একদিনে একটা বই পড়া হয়ে যায়? বলেছিলেন, সবটা কি পড়ি, অনেক বিষয়ই আমার জানা, যেটুকু নতুন মনে হয় তা-ই পড়ি। তারপর নাকি ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। পরিত্যক্ত বই বন্ধু-বান্ধবরা কিনে নিয়ে যেতেন ওই সিকি দামে। এমন উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্যই একসময় ওঁকে চাকরি হারাতে হয় এবং শুনেছি শেষ জীবন কেটেছে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে।

হরিনাথ দে-র (১৮৭৭-১৯১১) কথা আমরা পড়েছি শৈশবে পাঠ্যপুস্তকে। সম্ভবত তিনিই সবচেয়ে বেশি ভাষা জানা বাঙালি। আমরা যখন স্কুল-কলেজে পড়তাম সে-আমলে অনেকগুলো ভাষা জানাকে বিরাট পাণ্ডিত্য মনে করা হত। একই কারণে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সৈয়দ মুজতবা আলীও আমাদের মনে বিস্ময় জাগাতেন। ভাষাচর্চার সেই ধারা এখন হারিয়ে গেছে। পৃথিবীর সব দেশেই এই অবস্থা। ৯/১১-এর দুর্বিপাকের পর তদন্তের জন্য যখন আরবি জানা মানুষের সাহায্য দরকার হয়েছিল, আমেরিকানদের মধ্যে সেরকম মানুষ নাকি যথেষ্ট পাওয়া যায়নি।

ওই মহান ভাষাবিদকে নিয়ে 'ভাষাপথিক হরিনাথ দে' নামে একটি বই লিখেছিলেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় দশবছর আগে বইটি যখন আমার হাতে আসে এক বন্ধু মারফত তখনই তার জীর্ণ দশা। মলাট উধাও, পাতাগুলি পোকায় কাটা, বিবর্ণ। যদিও বইটি এত পুরোনো নয় যে এমন অবস্থা হবে। বৈশাখ ১৩৭৯ অর্থাৎ ১৯৭২ সালে ছাপা। দেখে মনে হয় বেশ দামি কাগজ, ছাপাও খুব সুন্দর। শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড থেকে ছাপা, সে-আমলে মুদ্রণ উৎকর্ষের জন্য যাদের অত্যন্ত সুনাম ছিল। লাইনো হরফ, যার তন্বী রূপের কাছে এখনকার কম্পিউটারে সাজানো অফসেট ছাপাও ম্লান মনে হয়। বইটির বর্তমান দুর্দশার জন্য বন্ধুটিকে দায়ী করা যায় না কেননা তিনি লেখকের কাছ থেকে পাওয়া মাত্র আমায় দান করে দিয়েছিলেন। প্রচণ্ড পড়ুয়া অথচ বইয়ের সংরক্ষণে উদাসীন মানুষটি বোঝা যায় নিজের বইয়েরও তেমন যত্ন নিতেন না।

সাম্প্রতিক অতীতে এক চিনা লেখকদল কলকাতায় এসেছিলেন, ওইসময় তাঁদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সযোগ পেয়েছিলাম সাহিত্য একাদেমির সৌজন্যে। দোভাষী মারফত অতিথিদের একজনের

কাছ থেকে জানতে পারি যে তিনি জীবনী লেখেন এবং এজন্য সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। শুনে আমার একই সঙ্গে আনন্দ এবং দুঃখ হয়েছিল। নিজেও একটু-আধটু জীবনী লিখি বলে জীবনীকারের সম্মানে আনন্দিত, আবার দুঃখিত এইজন্য যে আমাদের দেশে জীবনীকাররা এই সম্মান পান না। কিছুদিন আগে শতাধিক জীবনীগ্রন্থের লেখক মণি বাগচীর জন্মশতবার্ষিকী নিঃশব্দেই অতিবাহিত হয়েছে। একমাত্র আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ছাড়া এ নিয়ে কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। এত অসংখ্য পুরস্কার দেওয়া হয় সাহিত্যে কিন্তু জীবনীকারের জন্য কোনো পুরস্কার আছে বলে শুনিনি। ফলে ইংল্যান্ড-আমেরিকায় যে-ধরনের গবেষণা স্তরের জীবনী লেখা হয়, বাংলায় তার একান্ত অভাব। জীবনীগ্রন্থের সবচেয়ে বড়ো প্রকাশক দুই সরকারি প্রতিষ্ঠান—সাহিত্য অকাদেমি এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। কিন্তু সেখানে যেহেতু গ্রন্থের আয়তন সীমা নির্দিষ্ট থাকে, তাই বিস্তৃত গবেষণার সুযোগ নেই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রশান্তকুমার পালের বহু-প্রশংসিত রবীন্দ্রজীবনীর কথা মনে রেখেও বলছি, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বই বাংলা জীবনীসাহিত্যের এক লুকোনো রত্ন। কোনো একজন অত্যন্ত চর্চিত মানুষ সম্পর্কে লেখা আর একজন বিস্মৃত উপেক্ষিত মানুষকে নিয়ে লেখা, দুটো এক নয়। দ্বিতীয়টির জন্য দরকার হয় অনেক বেশি পরিশ্রম, গভীরতর অনুসন্ধান এবং একান্ত নিজস্ব ভালোবাসা। কিন্তু অন্ধ ভালোবাসা জীবনীর পক্ষে ক্ষতিকারক। উপরে লেখক সম্পর্কে কিছু নেগেটিভ কথা রয়েছে, তবে লক্ষ্য করলে দেখবেন তার মধ্যেও আছে একটা গুণের আভাস। এ এমন একজন মানুষ যে জলীয় আবেগ দিয়ে তৈরি নয়। নিজের যেটক অভিপ্রায়, শুধ সেই দিকেই নজর, বাদবাকি নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

এবার আসল কথায় আসি। নামপত্র-উৎসর্গ-কথামুখ ইত্যাদি বাদে বইটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৯৩। দাম পনেরো টাকা। প্রকাশক সঞ্জীবকুমার বসু (অভী প্রকাশন, ১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা ১), যাঁর সম্পাদনায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি নামে একটি পত্রিকা এখনও ওই ঠিকানা থেকে বেরয়। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন হরিনাথ দে সম্পর্কে কীভাবে তাঁর আগ্রহ জন্মায়। জন আলেকজান্ডার চ্যাপম্যানের (লেখক-কৃত বানান জন্ অ্যালিগ্জ্যাণ্ডার্ চ্যাপ্ম্যান্, বোঝা যায় ঠিক উচ্চারণ সম্পর্কে কী পরিমাণ সচেতন তিনি) বইয়ে হরিনাথ দের 'ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডির খণ্ডিত অংশগুলি' পড়ে তিনি প্রথম আকৃষ্ট হন। পাশাপাশি বিভিন্ন 'কুলীন গ্রন্থাগারে' হরিনাথ দের লেখা বইয়ের অনুপস্থিতি এবং বিদেশি ভাষাচর্চায় নিরত বহু প্রবীণ ব্যক্তিরও তাঁর সম্পর্কে প্রায়-অজ্ঞতা ভাবিয়ে তলেছিল তাঁকে। হরিনাথ সম্পর্কে প্রচলিত একটি কিংবদন্তী যা চ্যাপম্যান উল্লেখ করেছেন, 'If you quoted a line from any Latin play he could generally give you the next one', আমাদেরও কি হতবাক করে না? এই বিস্ময়মানবের কথা সকলের জানা দরকার, এই ভেবে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নায়কের জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হন।

এ বই সাধারণ পাঠক এবং পণ্ডিত সকলেরই পাঠের যোগ্য। ভাষা একটু ভারিক্কি হলেও পাঠে কোনো বিঘ্ন ঘটায় না। পণ্ডিতদের কথা ভেবে গবেষণাগ্রন্থের রীতি অনুযায়ী পাদটীকা, পরিশিষ্টে প্রাসঙ্গিক নথি, মনীষীর জীবনপঞ্জি ও বিস্তারিত রচনাপঞ্জি, সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি এবং নির্ঘণ্ট বিধৃত করেছেন। এই কাজে দেশ-বিদেশের নানা প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সাহায্য নিয়েছেন হরিনাথের আত্মীয়, ছাত্র এবং হরিনাথ সম্পর্কে অবহিত বিদ্বজ্জনদের। শেষোক্তদের যে দীর্ঘ তালিকা তিনি দিয়েছেন তা থেকে তাঁর গুরুতর প্রয়াস এবং ব্যাপক অনসন্ধানের কিছটা

পরিচয় মেলে।

ব্যক্তিকে যাঁরা তাঁর সময় ও সমাজের ফসল মনে করেন, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দলের মানুষ ছিলেন না। ব্যক্তিকেই তিনি, 'নিয়ামক শক্তিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা দিতে' আগ্রহী। হরিনাথ চর্চায় যে অনীহা ও ঔদাসীন্য দেখেছেন তিনি, সে-অভাব দূর করতে অজস্র দুর্লভ তথ্য ঘেঁটে এবং নিজের বহুভাষা জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে রচনা করেছেন হরিনাথ দের প্রথম ও সম্ভবত একমাত্র পর্ণাঙ্গ জীবনী। পরে ১৯৮৮ সালে ন্যাশনাল বুকট্রাস্ট থেকে Harinath De, Philanthrophist and Linguist নামে ইংরেজিতে ৬৭ পষ্ঠার যে-পস্তিকাটি বেরয় সেটিও তাঁরই লেখা। ইতিমধ্যে ১৯৭৭ সালে ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকেও Harinath De Centenary Volume নামে একটি মিতায়তন সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া আর কোনো কাজ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। হরিনাথ চর্চায় সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্দ্বিধায় পথিকতের সম্মান দেওয়া যায় এবং এতকাল পরে আজও এই ক্ষেত্রে তিনি দোসরহীন।

সরাসরি জীবন-বৃত্তান্তে প্রবেশ করার আগে হরিনাথের এক সামগ্রিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন লেখক শুরুতে। মাত্র ৩৪ বছরের আয়ু মানুষটির। এরই মধ্যে 'পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ভাষাগুলিতেই' কেমন করে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তা যেমন লেখকের তেমনি আমাদেরও বিস্ময়। কিন্তু শুধু তো ভাষাজ্ঞানই নয়, তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল প্রকৃতির মানুষ, লেখক যাঁর তুলনা টেনেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এবং বইয়ের পরবর্তী অংশে এমন অনেক ঘটনার কথা আছে যা এই তুলনাকে সমর্থন করে। কিছুটা বিদ্যাসাগরের মতোই, 'য়ুরোপীয়দের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও নিজের বাড়িতে তিনি সামান্য ধুতি পরিহিত একান্ত বাঙালীই ছিলেন।' হরিনাথের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ তাঁর স্মৃতিশক্তি। জীবনীকার লিখছেন, 'হরিনাথ যখন নতুন কোনও ভাষাশিক্ষণে তৎপর হতেন তখন তিনি কিছু শব্দ বাদ দিয়ে একটি শব্দকোষকেই কয়েকবারের পাঠে আত্মসাৎ করতেন।' এ কোনো লোকশ্রুতি নয়, হরিনাথেরই সহকর্মী ও উত্তরসূরি চ্যাপম্যানের লিখিত সাক্ষ্য। হরিনাথের ছাত্র ব্যারিস্টার অরুণ সেনও তাঁর শিক্ষকের এই দুর্লভ ক্ষমতার কথা জীবনীকারকে লিখে জানিয়েছিলেন। হরিনাথই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই ই এস (ইন্ডিয়ান এডিউকেশন্যাল সার্ভিস)। চাকরিতে ঢুকে গোড়ায় কয়েক বছর অধ্যাপনা করেছিলেন, পরে যোগ দেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির (যা এখন ন্যাশনাল লাইব্রেরি নামে পরিচিত) গ্রন্থাগারিক পদে। তিনি এই লাইব্রেরির দ্বিতীয় গ্রন্থাগারিক এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম।

ছাত্রাবস্থায় হরিনাথ ইউরোপে গিয়েছিলেন প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য। কেমব্রিজে থাকতেই আরবি-ফারসির প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মায়। আরবি সম্পর্কে জীবনীকারের নিজস্ব উপলব্ধি, 'যে-আরবী সভ্যতা বিশ্বসংস্কৃতির পরিপোষণের গুরুদায় একদিন বহন করেছে তার কতটুকু পরিচয় আমাদের ছিল! রামমোহন রায়ের আরবী-পারসীকচর্চা সত্ত্বেও আরবী সভ্যতার অবদান সম্বন্ধে ইংরেজী শিক্ষায় দীক্ষিত তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে এক অপরিসীম অজ্ঞতা সঞ্চিত হতে থাকে।' হরিনাথ এতটাই আরবি ভালোবাসতেন যে একজন খ্রিস্টান আরবকে কলকাতায় নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলেন। আরবিতে কবিতাও লিখতে পারতেন তিনি।

বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও হরিনাথ যে ভাষাতত্ত্বে মৌলিক কোনও অবদান রেখে যেতে পারেননি, এর কারণ 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো আপন প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রচণ্ড প্রতিষেধক ক্ষমতা' তাঁর ছিল না। জীবনীকারের এই মন্তব্য বঝিয়ে দেয় যে

আলোচ্য মানুষটির প্রতি গভীর সহানুভূতি সত্ত্বেও তিনি তাঁর মূল্যায়ন করতে চান নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে। তবে পাশাপাশি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে এও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ১৯০৭ সালের আগে ভাষাতত্ত্বে গবেষণা দূরের কথা কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে পঠনপাঠনই শুরু হয়নি। হরিনাথ নিজের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন চিনা, তিব্বতি, সংস্কৃত, পালি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি ভাষার বহু প্রাচীন কীর্তির উদ্ধার ও মূল্যায়নে।

জীবনীকারের পক্ষে সবচেয়ে কষ্টকর কাজ হল শৈশবের ঘটনাগুলি উদ্ধার করা, বিশেষ করে এমন এক মানুষের যিনি নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লিখে যাবার সুযোগ পাননি। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় নানা জনকে চিঠি লিখে ও বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও এই কাজটি করেছেন যোগ্যতার সঙ্গে। এতে যেমন আছে শিশুবয়সে 'একদিনেই বাংলা বর্ণমালা চিনে লেখা হয়ে গেল', এমন অবিশ্বাস্য ঘটনার বর্ণনা, তেমনি আছে হরিনাথের কৈশোর-যৌবনের ধারাবাহিক শিক্ষার্জনের কাহিনি। বাল্যশিক্ষা মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে। বাবা ছিলেন সেখানকার আইনজীবী। ছেলে যখন বড়ো হল তিনি তাকে এনট্রান্স পড়ার জন্য পাঠিয়ে দিলেন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। এখান থেকেই হরিনাথ এনট্রান্স এবং এফ এ পরীক্ষা পাস করেন। স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষালাভ প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৮৯৬ সালে প্রথমবার এম এ পাস করেন লাতিনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে। পরের বছরই ইংল্যান্ড যান কেমব্রিজে পড়ার জন্য। সেখানে থাকাকালেই বিশেষ ব্যবস্থা ক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রিক ভাষায় এম এ পাস করেন। কেমব্রিজেরও ডাবল ট্রাইপস তিনি। এই ট্রাইপস পরীক্ষা প্রসঙ্গে হরিনাথের মামাতো ভাই শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের জবানিতে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন জীবনীকার। আপাতদৃষ্টিতে তা গৌরবের নয়। পরীক্ষার আগের দিন হরিনাথ প্রচুর পানাহার করে বেসামাল হয়ে পড়েন এবং পরীক্ষায় বসার মতো অবস্থায় ছিলেন না। কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপকের শুশ্রুষার জোরে কোনোরকমে পরীক্ষা দেন এবং আশ্চর্য, উত্তীর্ণও হন। জীবনীকারের ধারণা, 'পানাভ্যাস তাঁর স্বদেশ থেকেই ছিল।' হরিনাথের চারিত্রিক দর্বলতাগুলিকে যদিও তিনি তাঁর বিদ্যাবত্তা থেকে আলাদা করে দেখারই পক্ষপাতী।

১ ডিসেম্বর ১৯০১ হরিনাথ দেশে ফিরে ঢাকা কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ঢাকায় থাকাকালে তিনি ১৯০৪ সালে ইবন বতুতার বাংলাদেশের বিবরণ এবং ইরানের কবি হাফিজের বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দিনের উদ্দেশে লেখা কবিতা অনুবাদ করে লর্ড কার্জনকে উপহার দিয়েছিলেন। ওই সময় পঙ্কজিনী বসু, মৃণালিনী সেন প্রমখ বাংলার কিছ মহিলা কবির কবিতাও অনুবাদ করেন টীকাসহ। এগুলি ছাপা হয় ঢাকার Journal of the Moslem Institute-এ। হরিনাথ ছিলেন মোসলেম ইনস্টিটিউটের একজন সক্রিয় সদস্য। পরে তিনিই আবার আনন্দমঠের কিছু অংশ এবং বন্দে মাতরম অনুবাদ করেন। তাঁর বহুবিধ কাজের মধ্যে এগুলি বিশেষ করে উল্লেখ করছি এইজন্য যে বঙ্গভঙ্গের সময়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ সত্ত্বেও হরিনাথ দৃশ্যত নিজেকে তা থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। মৌলবি আবু মুসা আহমদ-উল হককে তিনি নিজের ধর্মতলা স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন। হরিনাথের এরকম আরও অনেক মুসলিম বন্ধু ছিলেন, যাঁদের মধ্যে সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ড. আবদুল্লাহ আল-মামুন সুহরাবর্দি। তিনি হরিনাথ মারা যাবার পর তাঁর সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি লেখা লিখেছিলেন যাতে হরিনাথের রচনাপঞ্জিও ছিল। হরিনাথের জীবনী প্রণয়নে এই লেখার মল্য অসীম। জীবনীকার

অবশ্য তার উপর পরোপরি ভরসা করেননি। প্রয়োজনমতো যাচিয়ে নিয়েছেন অন্যান্য সত্র থেকে।

১৯০৬ সালে হরিনাথ দ্বিতীয়বার ইউরোপে যান বর্ধমানের মহারাজার দোভাষী হয়ে। মহারাজার অনুরোধে ইংরেজ সরকার তাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। জীবনীকার যে কত সতর্ক এবং একই তথ্য কীভাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে যাচাই করে নিয়ে লিখেছেন তা এই ঘটনার বিবরণ থেকেও বোঝা যায়। প্রথমে তিনি হরিনাথ যে ওই সফরে গিয়েছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন Journal of the Moslem Institute-এর একটি বিজ্ঞপ্তি। এ তো কেবল সূত্রপাত! এর পরে আছে ই ডেনিসন রসের লেখা থেকে হরিনাথের পোপ সমীপে নিজের ভাষাজ্ঞানের বাহাদুরি দেখানোর উত্তেজক বর্ণনা। পোপ একমাত্র লাতিনেই কথা বলেন। হরিনাথের লাতিন তর্জমা শুনে তিনি খুশি হয়ে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ইতালীয় ভাষাটাও শিখে নিতে। হরিনাথ তখন ইতালীয়তেও এক টি ছোটোখাটো ভাষণ দিয়ে পোপকে তাক লাগিয়ে দেন। সাহেবের বর্ণনার পর আর কি কিছু দরকার হয়, বিশেষ করে যখন তা নিজের বিষয়ের পক্ষে এমন গৌরবজনক। কিন্তু সনীল বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানেই থামেননি। তিনি মহারাজার নিজের লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত Impressions : The Diary of a European Tour-এরও পাতা উলটে দেখেছেন, যার সঙ্গে আশ্চর্যের ব্যাপার রসের বর্ণনার কোনো মিল নেই। তিনি লিখেছেন দোভাষী হিসেবে হরিনাথ নয়, অন্য কেউ উপস্থিত ছিলেন তাঁর সঙ্গে। এবার এ সমস্যার সমাধান হবে কী করে? অধ্যবসায়ী জীবনীকার ভারতে পোপের প্রতিনিধির কাছে চিঠি লিখলেন। জবাবে তাঁকে বলা হল সরাসরি ইতালিতে পোপের দপ্তরে খোঁজ নিতে। তা-ই করেছিলেন তিনি, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনো জবাব পাননি। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে আদালতের বিচারকরা যেভাবে দেওয়ানি মামলার মীমাংসা করেন preponderance of probability-কে কাজে লাগিয়ে, জীবনীকারও সেরকম উপায়েই সমাধান খুঁজলেন তৃতীয় পক্ষের সাক্ষ্য হাজির করে। রসের লেখা বেরনোর অনেক আগেই অঘোরনাথ ঘোষ লিখেছিলেন পোপের সঙ্গে মহারাজার সাক্ষাৎকারে হরিনাথের উপস্থিত থাকার কথা। লেখকের এইরকম বহুমুখী অনুসন্ধানের আরও অনেক পরিচয় আছে বইটিতে।

ইউরোপ সফর থেকে ফিরে ১৯০৬ সালে হরিনাথ হুগলি কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। সেই বছরই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিতে এম এ পাস করেন। পরের বছর এল তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড় যার পরিণাম অবশ্য তাঁর পক্ষে সুখকর হয়নি। তিনি যেহেতু পড়ানোর চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন পড়া এবং গবেষণা, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য হতেই দরখাস্ত করেন ওই পদের জন্য। সে-সময়ে বিদ্যায়তনিক মহলে সারা পৃথিবী জুড়ে হরিনাথের যে সুনাম তাতে তাঁর দরখাস্ত মঞ্জর না হওয়ার কোনো কারণ ছিল না এবং তিনি অনায়াসে ওই পদ লাভ করেন।

মাঝে মাঝেই তিনি এক একটি ভাষায় পরীক্ষা দিতেন এবং নতুন নতুন পালক যুক্ত হত তাঁর ভাষামুকুটে। সেইভাবে আরবিতেও ডিগ্রি অব অনার লাভ। তখনও বাকি ছিল সংস্কৃতে ডিগ্রি নেওয়া, ১৯০৮ সালে সেটা সম্পন্ন করলেন। পরের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন পি এইচ ডি থিসিস।

এ ছাড়াও তিনি সর্বদা নানারকম গবেষণায় নিযুক্ত থাকতেন। গ্রন্থাগারে কর্মরত থাকাকালে এশিয়াটিক সোসাইটিতে বেশ কয়েকটি গবেষণাপত্র পাঠ করেছিলেন। এর মধ্যে একটির বিষয়

ছিল আগ্রার তাজমহল। তাতেতিনি জোর দিয়েছিলেন 'তাজ নির্মাণে মেহনতী মানুষের ভূমিকার তথ্যানুসন্ধান'-এর উপর। দৈনিক বিভিন্ন শ্রেণির কত মজুর কাজ করত, তাদের কত মজুরি এসব তথ্যও জোগাড় করেছিলেন তিনি। ১৯১০ সালে হরিনাথ মোগল বাদশা শাহ আলমের জীবনী 'শাহ আলম নামা' সম্পাদনা করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁর মত্যর পরে এই বইটি ছাপে।

হরিনাথ ছিলেন একাধারে ভাষাবিদ, গবেষক, ঐতিহাসিক, শিক্ষক, অনুবাদক ও গ্রন্থ-সম্পাদক। এত যোগ্যতা সত্ত্বেও 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার যথার্থ দক্ষতা' তাঁর ছিল না, জীবনীকার একথা স্বীকার করেছেন। তিনি চোখ বুজে নির্ভর করতেন তাঁর কর্মচারীদের উপর। ফলে পরবর্তীকালে তাদের অযোগ্যতা ও দুর্নীতির দায় পড়ে তাঁরই ঘাড়ে। কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, যদিও অভিযোগ অনুযায়ী টাকার যে নয়ছয় হয়েছে সেগুলো গ্রন্থাগারিক নিজে তছরুপ করেছেন এমন কোনো প্রমাণ মেলেনি। ১৯১১ সালে তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। তাঁর উত্তরসূরি চ্যাপম্যান গ্রন্থাগারিক হিসেবে তাঁর অযোগ্যতার বিস্তর সমালোচনা করেছেন, কিন্তু পাশাপাশি হরিনাথের চরিত্রের ইতিবাচক দিকগুলিও উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি। হরিনাথ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জবাব দিতে একদা যে-প্রতিষ্ঠানে তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা সেখানে যেতে রাজি হননি। পরিবর্তে চ্যাপম্যানের বাড়িতে যাবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু সেখানে গিয়েও নিজের কর্মচারীর বিরুদ্ধে দু-চার কথা বলার পরই (যা শোনার আগ্রহ চ্যাপম্যানের ছিল না) বলতে শুরু করলেন লাতিন নাটক নিয়ে। যখন এই কথাগুলি তিনি বলছিলেন চ্যাপম্যান লক্ষ করেন, 'তাঁর বিরাট গোলাকৃতি মুখমণ্ডলে একটি দিব্য আভার মতো কিছু বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।' চ্যাপম্যানের তখন মনে পড়ে যায় জাদুঘরে রাখা 'বুদ্ধের মুখমণ্ডলগুলির কথা'। ওঠার সময় হরিনাথ চ্যাপম্যানকে বলেছিলেন, 'এইসব ব্যাপার চুকে গেলে আমি তোমাকে কতকগুলি বিষয় জানাব, যেগুলি তমি নিজে উদঘাটিত করতে পারনি।' কিন্তু পরে আর তা বলার সুযোগ পাননি তিনি।

১৫ আগস্ট ভারতের জাতীয় জীবনে যা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন, ১৯১১ সালে ওই দিনই হরিনাথের টাইফয়েড হয়। নানা ভাষায় বিভক্ত দুনিয়ার মানবসমাজে যোগসূত্র হবার বিরল ক্ষমতা ছিল যাঁর, বেঁচে থাকলে যিনি জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে আরও অনেক কিছু দিতে পারতেন, অমন বিরাট প্রতিভাধর মানুষ যে-টাইফয়েডকে এখন মামুলি অসুখ মনে করা হয় তাতেই পনেরোদিন ভুগে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে বিদ্বৎসমাজে বন্ধুদের কাঁদিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। জীবনীকার লিখছেন, শবযাত্রার সময় 'হরিনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ডঃ আব্‌দুল্লাহ অল্-মামুন্ সুহ্‌রাবর্দিকে সান্ত্বনা দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। শোনা যায়, তিনিও তাঁর বন্ধুর চিতায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন।' আর সে-মুহূর্তে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর মনে হয়েছে চিতার আগুনে 'যাচ্ছে পুড়ে নূতন ক'রে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।'

জীবনীকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা করেছেন কেননা হরিনাথের মৃত্যুতে তাঁরা কোনো সমবেদনা জানাননি। তাঁর ভাষাতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন 'অনেক ব্যাঘ্র-বিক্রম ভারতীয়ের' কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। ব্যাঘ্র শব্দের ব্যবহার দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কার দিকে তাঁর আঙুল। জীবিতাবস্থায় সেই আর-এক প্রবাদপ্রতিম শিক্ষাবিদের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটেছিল হরিনাথের। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে তাঁর বিতাড়নের মলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তার হাত থাকতে পারে বলে জীবনীকারের অনমান। হরিনাথের এক সহপাঠীও ছদ্মনামে একই কথা লিখেছিলেন একটি ইংরেজি দৈনিকে।

জীবনীকার বইয়ে অনেক জায়গায় হরিনাথের সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু দোষ-গুণ মিলিয়ে এই মানুষটির প্রতি তাঁর অত্যন্ত মমতা। কেন এই মমতা? জীবনীকারকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম বলে বইটি পড়তে গিয়ে বার বার মনে হয়েছে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় যেন হরিনাথেরই এক ছোটো সংস্করণ! দুজনের জীবনের ট্র্যাজেডির অনেক মিল। তাই বইটি হাতে নিয়ে দজনের জন্যই মনটা কেমন টনটন করে ওঠে।

ভাষাপথিক হরিনাথ দে—সনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
অভী প্রকাশন
দাম পনের টাকা

কবিতা নিয়ে নতুন কথা বলতে
কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকা

সম্পাদক : রিমি দে
সংবেদন. লেকটাউন (বিদ্যাপীঠ রেডের কাছে)
পো: শিলিগুড়ি টাউন ৭৩৪০০৪.
দার্জিলিং
ফোন: ৯৪৩৪৩৪৯৯৩৬ / ৯৮৩২০৫২০৮৫

সমীর বসুর সাহিত্যচেতনায় ঋদ্ধ
পদক্ষেপ
ফিরে দেখা : বাংলা ছোটগল্প
সম্পাদক:
অসীমকুমার বসু জ্যোতির্ময় দাস
৪. ব্রড স্টিট. কলকাতা-১৯

১৬ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে
লব্ধক
বাংলা সাহিত্যপত্র
সম্পাদক:
অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬এ লেক এভিনিউ. কলকাতা-২৬

৪২ বছর ধরে চলছে পাক্ষিক
সাহিত্যপত্রিকা
[illegible]
দপ্তর
পো: বাঁশবেড়িয়া. জেলা হুগলি
৭১২৫০২
মোবাইল: ৯৪৩৩৫০৩৩৯৬

দুঃস্বপ্নময় স্মৃতির শহরের গল্প জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১)

নাসির আহমেদ

আমরা যখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে জেমস জয়েসের লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই, সে পরিচিতি ছিল নিতান্ত আনুষ্ঠানিক ক্লাসরুমে অধ্যাপকদের ভারবাহী বক্তৃতার জলসায়। জয়েস আমাদের কাছে তখন বন্দী ছিলেন সিলেবাসের ফ্রেমে, সীমিত ছিলেন পরীক্ষার প্রয়োজনে। সাধারণত পরীক্ষার প্রয়োজনে যা হয়ে থাকত. জয়েস তেমন না পড়ে তাঁর মৌলিক অবদান— আধুনিক উপন্যাসে চেতনা প্রবাহ রীতির (Stream of consciousness technique) একজন প্রবক্তা হিসাবে জানাই দরকার ছিল আমাদের। সুতরাং জয়েসকে জানার উদ্দেশ্য যে আমাদের মহৎ ছিলনা সে বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে পাঠক হিসাবে এই অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে ওঠাও আমাদের পক্ষে সহজ ছিলনা: কারণ জয়েসের তিনটি সবচেয়ে স্মরণীয় সৃষ্টি—Dubliners, A portait of the Artist as a young Man ও Ulysses -যে বই তিনটি একে অন্যের সম্পূরক- আদ্যোপান্তে পড়ার সময় ও সুযোগ পরীক্ষার চোখরাঙানিতে পাওয়া সম্ভব ছিলনা। জয়েসের পৃথুল Ulysses যা অধিকাংশ সমালোচক ও পাঠকদের মতামতের নিরিখে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, তার আয়তনের কারণে সাধারণত পাঠ্যসূচী বহির্ভূত থাকে। তাই স্বল্পায়তনের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস A portrait of the Artist... জয়েসের ব্যক্তি ও লেখক সত্ত্বাকে নিবিড়ভাবে জানবার জন্য সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যবই হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়। ত্রয়ীর অন্যতম ডাবলিনার্সের গল্প পঞ্চদশ জয়েসের লেখকপর্বের সর্বপ্রথম রচনা যার প্রকাশ সাল ১৯১৪। অপেক্ষাকৃত কৃশকায় এই বইটি জয়েসের সমগ্র রচনার মধ্যে পাঠকদের কাছে সম্ভবত সবচেয়ে প্রিয় যদিও সবচেয়ে কম আলোচিত। কারণ গল্পগুলিকে অনায়াসে অপর দই উপন্যাসের প্রস্তাবিকা হিসাবে পডা যায়--ডিনারের পূর্বে পরিবেশিত ক্ষুধাবর্ধকের মত।

জয়েসের উল্লিখিত তিনটি বই স্থানগতভাবে আবর্তিত হয়েছে তাঁর নিজের ছোট গণ্ডীর শহর ডাবলিনকে কেন্দ্র ক'রে, যেখানে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে একে অন্যকে চেনে। গল্পগুলির প্রতিটি পাতায় ঐ শহরে বেড়ে ওঠা জয়েসের বয়সন্ধির স্ফুটমান অনুভূতিমালা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধরা পড়েছে। বস্তুত কৈশর থেকে যৌবনের বাইশ বছর পর্যন্ত জয়েস যে সামাজিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে তাঁর শহরে বড় হয়েছেন, ওই পরিমণ্ডল তাঁর চেতনায় যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে গল্পগুলি তারই ধারাবিবরণী। জয়েস ডাবলিন ছেড়ে চলে গেছেন ১৯০৪ সালে। ফিরে আসেন নি আর। বাসা বেঁধেছেন আতলান্তিকের ওপারে— মুক্তচিন্তার ইউরোপে, সঙ্গিনী, পরে তাঁর স্ত্রী নোরা বারনাকলকে নিয়ে বাকী জীবন কাটিয়েছেন ট্রিয়েস্টেও জুরিখ শহরে এবং অবশ্যই স্বেচ্ছা নির্বাসিত শিল্পী সাহিত্যিকদের মক্কা প্যারিসে। ইউরোপে স্বেচ্ছা নির্বাসনের জীবন ছিল জয়েসের কাছে তাঁর লেখকসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য. তাকে বিনির্মানের প্রয়োজনে। দয়স্তভস্কির যেমন

সেন্ট পিটাসবার্গ, মার্সেল প্রুস্তের যেমন প্যারিস, নোবেলজয়ী ওরহাস পামুকের যেমন ইস্তানবুল জেয়েসের কাছে ডাবলিন ছিল তেমনি অপরিহার্য এক সাহিত্যিক বিচরনক্ষেত্র। ডাবলিনের চেনা ক্ষুদ্র জগৎকে জয়েস দেখেছেন অনুবিশ্ব হিসাবে, যেখানে ডাবলিনবাসীর ব্যক্তিক ও আত্মিক সংকট সর্বজনীন প্রতীকে রূপায়িত হয়ে আধুনিক মানুষের সমস্যাকে তুলে ধরে।

'ডাবলিনার্স' প্রসঙ্গে জয়েস মন্তব্য করেছিলেন— এই বইএর গল্পগুলি তাঁর শহরের 'স্থবির আত্মার দর্পন— পরাধীন আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্ষয়িষ্ণু গতিহীন সমাজের জীবনালেখ্য। উনবিংশ ও বিংশশতকের সন্ধিক্ষণে জয়েস তাঁর সমাজে নারীপুরুষের সম্পর্কে দেখেছেন উদ্বেগপূর্ণ ও গন্তব্যহীন প্রেম—অবদমিত যৌনতা যে সম্পর্কের চালিকাশক্তি; দেখেছেন কিভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ— অনুশাসনের চাপে কৈশোর কাটে উচ্ছ্বাসহীন, আর যৌবন বিলীন হয় উদ্যমহীন আত্মকরুনায়; দেখেছেন ক্যাথলিক ধর্মের কঠোর প্রবিধান পুরুষ-শাসিত সমাজে কিভাবে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের অন্তরায় হয়ে তবুও মান্যতা পায়। যে কোন শিল্পীর কাছে এমন শহর মানসিকভাবে বাইবেল বর্ণিত ব্যাবিলনের মত—'Fallen, fallen that great city' জয়েস তাঁর শহরে দেখেছেন গম্ভীর গির্জামুখী বয়স্ক নারীপুরুষ, উচ্ছল কিশোর কিশোরীর নিস্ফল যৌন চেতনার অন্তদহন, দেখেছেন বিপত্নীক মধ্যবয়সী ক্লান্ত অফিস কর্মীর নিঃসঙ্গ ঘরে ফেরা। সুদূর ইউরোপবাসী হয়েও জয়েস নিজের শহরের প্রতিটি রাস্তা ও পার্কের নাম স্মরণ করেছেন প্রায় সম্মোহনের মত এবং নির্দ্বিধায় বলা যয়, এই সম্মোহনের শিকার পাঠকও। ডরসেট স্ট্রীট, রাটল্যাণ্ড স্কোয়ার, ব্যাগট স্ট্রীট, কিলডেয়ার স্ট্রীট, নাস রোড, রিচসণ্ড রোড, কোপেল স্ট্রীট, গ্রাফটন স্ট্রীট ডাবলিনের এমন অজস্র রাস্তা ও পার্ক শহরের শিরা উপশিরা ও হৃদপিণ্ড হয়ে ডাবলিনবাসীর প্রতিদিনের জীবনকে সেভাবে স্পন্দিত করেছে, পাঠকের প্রশ্ন জাগে, কলকাতার পথ-ঘাট পার্কের এমন চিরকালীন হয়ে ওঠা বর্ণনা সে কি কোথাও পড়েছে? রবীন্দ্রনাথের 'গোরার' কলকাতা কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়'এর? সে তো একটি সময়ের কলকাতা—সময়াতীতের নয়। আক্ষেপ এই, সেন্ট পিটার্সবার্গ, প্যারিস, ইস্তাম্বুল বা ডাবলিনের ভাগ্য নিয়ে কলকাতা জন্ম নেয়নি। জয়েসের গল্পে ডাবলিনে ক্লান্তিকর অভ্যস্ত দিনের ক্ষেত্রে শীতের সন্ধ্যা নিয়ে আসে প্রতি ঘরে। কুয়াশার মত বুকচাপা বিপদ; যদিও ক্ষণিক গ্রীষ্ম ফিরিয়ে আনে কয়েকটি পলাতক বিদ্রোহী মনে অপচিত প্রেমের স্মতির তপ্ত আবেগ। এভাবেই ডাবলিনার্স গল্প থেকে জন্ম নিয়েছে জয়েসের বিদ্রোহী আত্মা 'A portrait of the Artist as a young man'এর স্টিফেন ডিডেলাস, তাঁর পূর্ণাঙ্গ আত্ম জৈবিক চরিত্র। স্টিফেনের মত জয়েস স্বঘোষিত লেখক জীবনকে ব্রত করে ডাবলিন ছেড়ে যেতে চেয়েছেন— অজর, নিষ্ক্রিয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত শহরকে নিরাসক্তি আর নির্মোহে ফিরে দেখতে, তাকে অপরিহার্যভাবে পনরুদ্ধার করতে যাকে দরত্বের বিভ্রমে তিনি খঁজে পান লেখার প্রেরণা হিসাবে।

বই-এর প্রারম্ভিক গল্প 'Sisters'এ জয়েস দেখিয়েছেন নারীর প্রান্তিক উপস্থিতির কারনে আনন্দহীন এক পারিবারিক সমাজ আদল যে সমাজে মাতৃতান্ত্রিক গৌরবগাথা শুধু আইরিশ লেখাকল্পনার বিষয়বস্তু। চিরশত্রু ইংরেজজাতি কবলিত মাতৃভূমি আয়ার্ল্যাণ্ড দলিত, ধর্ষিত হয়ে মূল্যহীন করেছে নারীর সামাজিক ব্যক্তিত্ব— এবং তার স্থান নিয়েছে একটি উগ্র, কপট পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পরাধীন ও হীনমন্যতায় আক্রান্ত আইরিশ জাতির আত্মিক ক্ষতে প্রলেপের মত; আর তাকে সাহায্য করেছে সমসাময়িক ক্যাথলিক রীতিনীতির অনশাসন। গল্পে হৃদরোগে আক্রান্ত

প্রতিবেশী পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষপ্রধান ক্যাথলিক পুরোহিত ফাদার ফ্লিনের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন বয়স্ক ভগিনীদের আত্মনিবেদিত সেবার জীবন সমাজের কাছে তেমন মল্য পায়না কিশোর ছেলেটি তা মমতা দিয়ে উপলব্ধি করে।

'Araby' গল্পের বিষয়বস্তু কিশোর প্রেমে যৌনতার উন্মেষ, যা রোমান্টিক আবেগে বিমূর্ত। ছেলেটি আর্থারিয় নাইটের মত খুঁজে আনতে গেছে বন্ধু ম্যানগানের ভগিনীর জন্য উপহার— আরব্য উপন্যাসের মত এক গল্পলোকের বাজারে। শহরের একপ্রান্তে ভাঙ্গামেলায় যখন রাতের গভীরতা নামে, সে লক্ষ্য করে একটি সেলসগার্লের সঙ্গে দুই ইংরেজ যুবকের অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা। একে একে বন্ধ হওয়া পসারীদের সাধারণ দোকানগুলি দেখে প্রাচ্যীয় জাঁকজমকপূর্ণ কল্পিত বাজারকে সে খুঁজে পায়না। সে মিল পায়না দুই যুবক যুবতীর স্থূল বাস্তব যৌন সম্পর্কের সঙ্গে ম্যাগলানের ভগিনীকে ঘিরে তার কল্পজগতের শৌর্যময় যৌনতা। কিশোর যুবক 'Araby' মেলা থেকে ফিরে আসে রাতের শেষ ট্রেনে— মোহভঙ্গ আর আত্মধিক্কার নিয়ে।

বই-এর বাকী গল্পগুলির বিষয়বস্তুর সুর একই তারে বাঁধা— স্থবির ও অসাড় সমাজে ডাবলিনবাসীদের দিনযাপনের গ্লানি, অবরুদ্ধ সমাজের কশীলবদের আত্মতষ্ট অহংবোধ, যা তিলে তিলে ক্ষয় করেছে তাদের আত্মা। Two Gallants, the Broarding House ও A little cloud এই তিনটি গল্পের বিষয়বস্তু প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর প্রেম যা যৌন অবদমিত সমাজে পরিপূর্ণ বিকাশের পথ না পেয়ে বিচিত্র পরিনতির দিকে ধাবিত। পুরুষের কাছে কখনো সে প্রেম নারীর উপর দমনমূলক সামাজিক নিয়ন্ত্রনের মধ্য দিয়ে ও নারীর কাছে পরুষের প্রতিস্পর্ধা হয়ে সে প্রেম মক্তির পথ খোঁজে।

A Little Cloud গল্পে জয়েস প্রেমের পাশাপাশি সমসাময়িক আইরিশ সমাজের মল্লিনাথ মণ্ডলী স্বীকৃত গতানুগতিক সাহিত্যধারার অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরেছেন। গল্পের নায়ক লিটল স্যাণ্ডলার তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য। খর্বাকৃতির স্যাণ্ডলার কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখে ইয়েটস ও ডগলাস হাইডকে অক্ষম অনুকরণ করে আর চায় কেল্টিক পুরানের অসার পুনর্নির্মাণ করে ফিরে পেতে অলীক স্বপ্নময় বাস্তবের দেশ। অথচ তার চোখ হতদরিদ্র সমাজের নিদারুন বাস্তব সমস্যাগুলি দেখতে পায়না; যথার্থ মানবিক সংবেদনে ফুটিয়ে তুলতে পারেনা ভবঘুরে দারিদ্র্যমলিন ফুটপাতবাসীদের কষ্ট। তার লক্ষ্য সম্ভবত ব্রিটিশ সমালোচকের প্রশস্তি। কারণ তার গদ্যের কৃত্রিম কারুকাজে কেল্টিক বিষন্নতার আবহ জাগিয়ে সেই সব সমালোচকদের বাহবা মেলে সহজে।

জয়েসের এই নির্মমতা এসেছে তাঁর আপোষহীন শিল্পীমনের অনতিক্রম্য স্বভাব থেকে। তিনি শিল্পী ও সমাজের সম্পর্কে চেয়ে ছিলেন পক্ষপাতহীন চুক্তি। ফ্লবেয়রের মত বিশ্বাস করতেন, শিল্পী নিরাসক্তি আর নির্মোহে দীক্ষা না নিলে কালজয়ী বাস্তবকে সৃষ্টি করতে পারে না। ডাবলিনার্সের গল্পগুলিতে জয়েস পৃথিবীবিমুখ এক স্থবির সমাজকে নির্মম বাস্তবের মুখোমুখি করেছেন— এক অনিঃশেষ বিষণ্ণতায় ডাবলিনের সত্তাকে জাগরূক রেখেছেন যে বিষন্নতা গ্রীক ট্রাজেডীর নিয়তির মত পরিত্রানহীন। জয়েস অবশ্য তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস ইউলিসিসে এই প্যারোডক্স— দুঃখের নিস্কৃতিহীন প্রহেলিকাকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। বহমান জীবনকে জানিয়েছেন স্বাগত। চব্বিশঘন্টায় সীমিত ডাবলিনের একদিনে কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্র লিওপোল্ড ও মনিব্লুম এবং স্টিফেনের আশ্চর্য্য জীবনীশক্তির কাহিনী শুনিয়ে জয়েস সম্ভবত বলতে চেয়েছেন— সমগ্রভাবে উপলব্ধ জীবনই মানষের কাম্য।

বর্ণাঢ্য ভদেব ভগত

বিশ্বজিৎ সেন

বিবর্ণ পোস্টকার্ড ঃ ভূদেব ভগত। প্রকাশক - কাজল সেন, কালিমাটি প্রকাশনী, ৩, অতসি রোড, প্রমথ নগর, জামশেদপর, ঝাড়খণ্ড-৮৩১০০২। বিনিময় মল্য ঃ ১০০ টাকা।

সাম্প্রতিক যে কয়টি বাংলা পত্রিকাকে আমার সতত সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়েছিল ''কালিমাটি'' তাদের মধ্যে একটি। যে জামশেদপুর থেকে একদা ''কৌরব'' প্রকাশিত হয়েছে, সেখান থেকেই প্রকাশিত ''কালিমাটি''। যখন ''কৌরব'' মধ্যাহ্ন গগণের সূর্যের মত দেদীপ্যমান, তখনও ''কালিমাটি'' ছিল। আজ ''কৌরব'' জামশেদপুরে নেই, ''কালিমাটি'' আছে, কিন্তু তখনও যেমন, আজও তেমন ''কালিমাটি''র গতি প্রকৃতি একই। পত্রিকা খোলামাত্র কলকল করে বেজে ওঠে অনেক কটি কণ্ঠস্বর— কেউ নতুন, কেউ পুরোনো অথচ এমন কেউই নন যাঁকে না শুনে আপনি থাকতে পারবেন। এই অর্কেস্ট্রা-র পরিচালক শ্রীকাজল সেন, যাঁকে অদ্যাবধি চোখে দেখা হয়নি। তবে তাঁর ব্যক্তি কাঠামোর যেটুকু সুবাস বাতাসে ভেসে এসেছে, তাতে বোঝা যায় তিনি সত্যিই একজন সংস্কৃতিনিষ্ঠ মানুষ। তাঁর লেখা ছোট ছোট চিঠিগুলিই তা বুঝিয়ে দেয়। ভাষার পরিমিতিবোধ এবং লেগে থাকার ক্ষমতা তাঁর অসামান্য। অতএব, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, যে ভূদেব ভগতকে তিনিই আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

প্রথম ''কালিমাটি''র কোনো একটি সংখ্যায় পড়ি ''মহারাজার তবলা'' এবং পড়েই বিস্মিত হয়েছিলাম। লেখকের রচনাভঙ্গী এতই সরল, আনকোরা ও স্বচ্ছ যে চমকে উঠতে হয়। তখনও আমি অবহিত নয় যে তিনি আন্তর্জাতিক মানের ফটোগ্রাফার, তবে মনে হয়েছিল হয়ত তিনি ছবি আঁকিয়ে— তাই তাঁর এই অসামান্য দৃষ্টি। আর্ট কলেজের পড়ুয়াজীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুসন্ধান, অথচ দেখার বৈশিষ্ট্য তা ভোরের শিশিরবিন্দুর মতো টলটল করছে। এই অভিজ্ঞতা তো আরও অনেকের হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ লেখালেখিও করেন, কিন্তু তাঁরা এত সহজে এ কথাগুলো বলে উঠতে পারেন কই? নিখিল বলে আর্ট কলেজের যে ছাত্রটি প্রায় উলঙ্গ হয়ে সারাগায়ে কাদা মেখে রাঁদার ''থিংকার'' সেজে বসেছিল, প্রথম পুরষ্কার পাবার খবরে কাদা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে তার উল্লাসিত দৌড়টি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাই আমরা। দেখিয়ে দেবার এই ক্ষমতা, যা ভদেবের আছে, অনেকেরই নেই, এ কথা অনস্বীকার্য।

অথচ, হ্যাঁ এখানেই ''অথচ'' শব্দটি যোগ করতে হচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু ভূদেবের পারিবারিক পৃষ্ঠভূমিতে কোথাও এর আগাম আভাস নেই। আমরা, সংস্কৃতির মানুষেরা যাকে ''সোজাসাপ্টা'' বলে অভিহিত করি, ভূদেবের পরিবার কিছুটা সেই ধরনের। পিতা টাটার কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার, ইচ্ছে ছিল ছেলেও তাই হবে। তারও আগে ... ইতিহাসে অনেক অনেকটা পেছিয়ে যান যদি, তবে গয়ার নিকটবর্তী মগধ অঞ্চলে থেকে সিংভমে গিয়েছিলেন ভদেবের পরিবার। পারিবারিক

শ্রুতি তাই বলে। শুধু মাঝখানে ঝলসে ওঠে রাখালচন্দ্রের নাম, যিনি ভূদেবের পূর্বপুরুষ। তাঁর অণুদত্ত জমিতে ইংরেজরা তামার খনি গড়েছিল, তাই তাঁর নাম থেকেই খনির নাম ''রাখামাইন্স''। অর্থাৎ ভূদেবের পরিবারের দৃষ্টি সম্মুখ পানে প্রসারিত ছিল। সভ্যতা এগিয়ে চলুক, এই আশঙ্কা ছিল পরিবারটির। কিন্তু তা বলে স্বাধীনতা যুদ্ধেরও বিরোধী ছিলেন না তাঁরা। এই বোধ তাঁদের ছিল যে স্বাধীনতাযুদ্ধও অগ্রসর মানতা-রই একটি পর্যায়, যেইবোধ থেকে সভাষচন্দ্রের অভ্যর্থনার পরোভাগে দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের পরিবারকে।

বিশদ আলোচনায় না গিয়েও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে উনবিংশ শতকের রেনেসাঁ নিয়ে আজও আলোচনায় মন্দ্রিত বুদ্ধিজীবী মহল, তারই সমানান্তর একটি রেনেসাঁ খুব নিঃশব্দে ঘটছিল সিংভূমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে— যার পূর্ণপ্রস্ফুটিত রূপ ভূদেব ভগত। অতএব এই লেখাগুলির লিখিত হওয়া বা ''বিবর্ণ পোস্টকার্ড'' বইটির প্রকাশিত হওয়া কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। সংস্কৃতির ইতিহাস এভাবেই তার পথের সংগ্রহ করে নেয়।

আর কি নিপুন, কত নিখুঁত সেই সংগ্রহ করার কায়দা। ভূদেবের মাধ্যমে সে সংগ্রহ করেছে এত অজস্র খুঁটিনাটি, অভিভূত করে দেওয়া এমন পসরা যে তাক লেগে যায়। জামশেদপুরের সেই মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর্বটিকে আমরা সবাই ভুলে গেছি। জামশেদপুর শহরের কোথাও তার লেশমাত্র চিহ্ন নেই, কিন্তু ''আমি অজগার আলি'' পড়তে পড়তে সেই দিনগুলি আবার মনে পড়ে যায়। সেই সাম্প্রদায়িক ধ্বংসলীলা বড় সামান্য ছিল না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেই বিস্ফোরণে এতদূর বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন, যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেকে পাকিস্তানের পথে পা বাড়ান। অজগার আলি তো সাধারণ মানুষ, তাঁর চলে যাওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। অথচ পাকিস্থানে গিয়েও তাঁর মন বসল কই? আজও তিনি বুকে জড়িয়ে ধরতে চান তাঁর শৈশবকে, তাঁর জামশেদপুরকে। আর এমনই ইতিহাসের সংযোগসাধনক্ষমতা দেখুন, ভূদেবপুত্র নীলাদ্রি তাঁর চালিত থ্রী হুইলারেই লাহোর সফররত, যে ভূদেব অজগারের বাল্যবন্ধু। অজগার আলি আক্ষেপ করে বলে ''চৌলকো কোম্পানিতে আমি নোকরি ভি পেয়েছিলাম, ছেড়ে দিলাম উল্লুর মতোন। আব্বা খোয়াব দেখালো, পাকিস্তানে সুখে থাকবো। তোখোন কি জানতাম ইণ্ডিয়া ভি যো, পাকিস্তান ভি ওই! এখোন আফসোস করি।''

টুকরো টুকরো মাণিমানিক্যে ঝলমল করছে ''বিবর্ণ পোস্টকার্ড''। কাউকেই ভুলতে পারি না আমরা, বইটি পড়া শেষ হয়ে যাবার বহুক্ষণ পরেও। ভুলতে পারি না ভূদেবের পিতাকে, জীবনের শেষ পর্বে যাঁরা মনোবিকলন ঘটেছিল। নিজের স্ত্রীকে প্রশ্ন করতেন ''তুমি এখানে কি করছো? কোথা থেকে এলে? এই টাটার কারখানায় কে তোমাকে চাকরি দিলো? কতদিন ধরে কাজ করছো? আমাকে তো বলোনি? ব্যাপারটা কি?'' চা খেয়ে ভুলে যেতেন, বলতেন ''আমাকে তো চা দিলে না তোমরা? কই গো চন্দ্রিমা—'' অথচ এই মানুষকেই টাটা কোম্পানী ট্রেনিং নিতে বিলেতে পাঠিয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, ১৯৪২ সালে। সময়ের নদী বয়ে চলেছে ভ্রুক্ষেপহীন। দুই তটে মুছে যাচ্ছে কত মানববসতি, সেদিকে দৃকপাত নেই তার। মেধাবী ইঞ্জিনীয়ার রামবাবু মুছে গেছেন, যেমন মুছে গেছেন রানু— ভূদেবের শৈশবসঙ্গিনী। কেবল এই বইটির পাতায় বেঁচে আছেন তাঁরা। ভূদেব একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কর্তব্য সমাধা করেছেন বইটি রচনা করে। তার জন্য তাঁর কাছে আমাদের ঋণ কোনদিনই ফুরোবার নয়।

ঋণবোধের আরেকটি কারণ এই যে ''কালের যাত্রায় ধ্বনি'' শুনতে পাচ্ছি আমরাও। ক্ষিপ্রবেগে

গড়াচ্ছে বিশ্বায়নের চাকা। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন পর্ব থেকে গত শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত যে সমাজ আমরা দেখেছি, কি মূল্যবোধে, কি সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে, কি মানবিক বিবেচনায়, আজ সে আমূল নিশ্চিহ্ন! এই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার দায় কার কাঁধে চাপবে, তা স্থির করা দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু আমরা হাজার কাজের মধ্য থেকে একটু সময় সঞ্চয় করে নিয়ে কিছু লিখে তো রাখতে পারি অন্ততঃ। নইলে আগামী প্রজন্ম জানতে পারবে না, কেমন আশ্চর্য মানুষজন হেঁটে চলে বেড়িয়েছেন এই মাটির পৃথিবীতে। তাঁদের বিচিত্র শখশৌখিনতা, তাঁদের উদাত্ত মানবিকতা— এগুলির প্রসঙ্গ লুপ্ত হয়ে যাবে একেবারেই। সত্যজিত রায়ের সেই ভাগ্নেটি, যিনি ''মধুক্ষরা'' নামে একটি মিষ্টির দোকান চালাতেন এবং সাপ পুষতেন, সাপের খাদ্য (প্রজাপতি, টিকটিকি, ফড়িং) এনে দেবার জন্য মিষ্টির দোকানের ছেলে ছোকরাদের একআনা করে দিতেন— তাঁর কথা ভূদেব আমাদের না জানালে আর কে জানাতো?

''বিবর্ণ পোস্টকার্ড'' বইটির সর্বাঙ্গে পরিশ্রমের ছাপ সুস্পষ্ট। বহুমুখী প্রতিভার আকর ভূদেব ভগত, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ— আর সেই সঙ্গে কাজল সেনের নির্বাচন ক্ষমতাও তাক লাগিয়ে দেয় আমাদের। তাঁর ''কালিমাটি'' পত্রিকাটি সুসম্পাদিত, তা অনেক পত্রিকাকেই তো একই অভিধায় ভূষিত করা যায়। কিন্তু তিনি যে বাস্তবে একজন জহুরী, সে বিষয়ে ইতিপূর্বে অবহিত ছিলাম না আমরা। তাঁর কাছ থেকে আরো অনেক কিছু, আরো অনেক জনকে পাবার আশা রাখছি— এই ধ্রুব প্রত্যয় সহ যে আমাদের আশা বিফল হবে না।

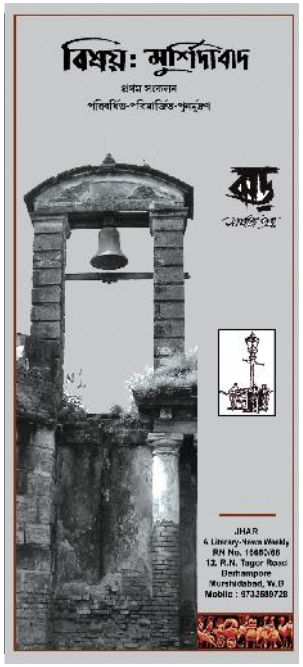

পরিবর্ধিত-পরিমার্জিত হয়ে
পনর্মুদ্রিত হতে চলেছে

বিষয়: মুর্শিদাবাদ

প্রথম সংকলন

উল্লেখ্য, পূর্বতন বিভিন্ন লেখায় আরো কিছু ছবি ও দুর্মূল্য ফটোগ্রাফ তখন হাতে না আসায় দেওয়া সম্ভব হয়নি। পরিমার্জিত সংকলনে সেইগুলি থাকবে। সংযোজিত হবে অতিরিক্ত তথ্য। এমনকি অতিরিক্ত দ-একটি তথ্যপর্ণ লেখাও।

অনেকদিন আগেকার আকাশ কি খব কাছে?

অনপম মখোপাধ্যায়

'কয়াশা কেবিন, কেন?

স্কুল থেকে সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে দেবাশিস সাহার ফোন পেলাম। ছাপাখানার গলির পরবর্তী সংখ্যাতে তিনি কেবলমাত্র কিছু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের আলোচনা রাখতে চান। আমার সেটা খুবই চমৎকার পদক্ষেপ মনে হলো। দেবাশিস জানালেন তিনি আমার নাম তাঁর লেখকসূচীতে দেখতে চান। আমি ঈষৎ বিপন্ন হলাম, যখন তিনি বললেন লেখাটা তাঁর যতসম্ভব তাড়াতাড়ি চাই। আমার সমস্যাটা হলো ঃ কোন বই নিয়ে লিখবো? 'দুষ্প্রাপ্য' শব্দটার সঙ্গে অনেকেই 'সময়'কে সম্পর্কিত ভাবতে পারেন। কিন্তু আমার সেটা মনে হয় না। আমার মনে হলো একশো বছর আগে প্রকাশিত, অধুনা বিলুপ্ত কোনো বইয়ের চেয়ে আমার একটু আগের প্রজন্মের কোনো কবির কাব্যগ্রন্থ আমি বেছে নিতেই পারি। কিন্তু এই কবি কে হতে পারেন? যে কবিদের নাম আমার মাথায় এলো, তারা হলেন— অমিতাভ মৈত্র, স্বপন রায়, সদ্যপ্রয়াত সুশীল ভৌমিক, ধীমান চক্রবর্তী এবং স্বদেশ সেন। অমিতাভ মৈত্রর 'টোটেম ভোজ' একসময় (মাত্র এক দশক আগেই) অনেককে প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু এখন কেউ চাইলেও তাকে কিনতে পারবেন না, কবি নিজেই এখন বইটি জেরক্স করিয়ে উপহার দেন। 'টোটেম ভোজ' বাংলা কবিতার একটি অগোচর দিকচিহ্ন হলেও আমি তাকে নিয়ে কবিতা পাক্ষিকের পাতায় ২০০৪ সালে লিখেছি, আর হয়তো এখন লিখতে চাইব না। সুশীল ভৌমিককে নিয়ে এখন অনেকেই লিখছেন, তাঁর বইকে বহরমপুরে দুষ্প্রাপ্য হয়তো বলাও যায় না। ধীমান চক্রবর্তীর কোনো কাব্যগ্রন্থ আমার কাছে আপাতত নেই। আর স্বপন রায়? তাঁর দুটি বই আমার কাছে আছে— 'কুয়াশা কেবিন' আর 'ডুরে কমন রুম'। বইদুটির ক্ষেত্রে 'দুষ্প্রাপ্য' বিশেষণটি অব্যর্থ খেটে যায়। অনেকের স্মৃতির কাছেই থাকতে পারে, কিন্তু নতুন করে তাদের সংগ্রহ করতে হলে এখন জেরক্স ছাড়া উপায় নেই। এদের মধ্যে আবার 'কয়াশা কেবিন' বেরিয়েছিল অক্টোবর, ১৯৯৫ সালে, 'ডরে কমন রুম' এরও আগে। অতএব—

প্রবেশ করা যাক কেবিনেরই কুয়াশা ঠেলে

যারা বিতর্ক করে করুক, আমার কাছে 'কুয়াশা কেবিন'ই লেখার জন্য দুষ্প্রাপ্য বই। যাদের কপাল কুঁচকে যাবে, আমি তাদের বলবো, ''যান। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো বই দোকান থেকে বইটা কিনে আনুন। টাকা আমি দিচ্ছি।'' আমি জানি আমার টাকা আমার পকেটেই থাকবে।

'কুয়াশা কেবিন' বইটি শুরু করতে গেলে প্রচ্ছদে দেখা যাবে—

স্বপন রায় নির্মিত

কুয়াশা কেবিন

মলাট নীল। অক্ষরগুলো সাদা। অসাধারণ কোনো প্রচ্ছদ নয়। যেহেতু দেবনীল ভট্টাচার্য তাঁর পরিকল্পনায় কোনো মখরতা রাখেননি, আমাদের বলারই কিছ নেই। তব পাকামি করে

বলতে ইচ্ছে করে— যে কাব্যগ্রন্থের নাম এত অতলছোঁয়া, তার প্রচ্ছদের কাছ থেকে আমাদের ফিরে আসতে মন চায় না. টোকা মেরে দেখতে চায় জানালা আছে কিনা। একে দাউদাউ বলো. কিম্বা ফাউ।

বেরিয়েছিল 'কবিতা ক্যাম্পাস প্রকাশনা' থেকে, যেমন বলেছি ১৯৯৫ সালের অক্টোবরে। চার ফর্মার বই। দেওয়া হয়েছিল বারীণ ঘোষালের চেতনা ঘরে। কেন বারীণ ঘোষাল? এই প্রশ্নটা তেমনই— আমরা অক্সিজেন কেন নিই? স্বপন রায়ের নতুন কবিতা পর্বের প্রথম বই বারীণ ঘোষাল ছাড়া আর কাউকে দেওয়া চলে কি? 'কুয়াশা কেবিনে'র আগে স্বপন রায়ের চারটি বইয়ের শেষ দুটি হল— 'চে' (১৯৯০) এবং 'লেনিন নগরী' (১৯৯২)। সেখান থেকে 'কুয়াশা কেবিন'। শব্দ, বাক্য, ভাষার পরিবর্তনে এটা হয় না। চেতনা যখন অতিচেতনাকে স্পর্শ করে, তখনই হয়। আর, এখানে পাওয়ার হাউস বারীণ ঘোষাল তো অবশ্যই।

প্রচ্ছদে 'স্বপন রায় নির্মিত' ভললে চলবে না।

"অনুভূতি নিয়ে কথা বলতে বলতে অনুভূতিটাই চলে যাবে দেখছি!" শততম টেস্টম্যাচ খেলার আগে মেলবোর্নে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বপন রায় কবিতা নির্মাণ করেছেন 'কুয়াশা কেবিনে'। তিনি কবিতার নির্মানে বিশ্বাস রাখেন। তার মানে কি এই যে তাঁর কবিতা কোনো অনুভূতি থেকে শুরু হয় না? তার মানে কি তিনি শব্দের পাশে শব্দ সাজিয়ে চলেন, কোথাও তাঁর পৌঁছনোর থাকে না কবিতায়?

সেটা ঘটে, স্বপন অনুভূতিতে কবিতা শুরু করেন। সেই অনুভূতি হতেই পারে পারিপার্শ্বিক পৃথিবী থেকে আসা। পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, চাকরি, প্রেম, দাম্পত্য, যৌনতা, বন্ধু, প্রকৃতিপ্রেম— যে কোনো কিছুর সঙ্গেই সেই অনুভূতি সম্পর্কিত হয়ে আসতে পারে। চোখের-মনের পৃথিবী স্বপনকে সেটা দেয়। তারপর প্রলোভন দেয় সেই অনভতির একটা জেরক্স কবিতায় বানাতে। একটা কবিতা পড়ে ফেলি—

শ্রুতিমা ঃ কফি
খুব সহজের আকাশ
কোন মুখে ফেলা, কোন
        হৃদয়ঘটিত কফি
কি রঙের চলো কুয়াশারা
ভোর ভোর হৃদ নিয়ে ব্যস্ত
        সেই আলোমি

সব কোণেই
আঙুল তোলা নিষেধ
আলো—ক্ষীর
আলো বসানো হাত মোজা
তাহলে কি টলবে না
        একট দেখার সময়

কফীশ বুক, তরঙ্গ যার বোতামে
কোনাচ বোনা একা।

যে একজন খুনী
        অসময়ে আসতো ব'লে ব'লে

এই কবিতা পড়ার পর আমাদের আর আবেগ নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না, সন্দেহ থাকে না কবির অনুভূতির সত্যতা নিয়ে। তবে মনে হয়, মূল অনভতিটা কোথায় গেল? জেরক্স মেশিনে কি কালি ছিল না? নাকি আমরাই অন্ধ হয়ে গেছি!

অনুভূতি এবং কল্পনা— এরা কোথায় কোনটি শেষ হয়, কোথায় কোনটি শুরু হয়, কেউ বলতে পারে না। একজন প্রকৃত কবি এদের মধ্যে কোনো সীমারেখা হয়তো রাখতে চাইবেন না। দুটো একাকার হয়ে গেলেই মঙ্গল। তাহলে আসবে কল্পনাতীত। বিশেষ অনভতির বিশ্বজনীন হয়ে ওঠা।

প্রতিষ্ঠিত শব্দে, ফর্মে সেই কল্পনাতীত ধরা দেয় না। সেক্ষেত্রে অনুগমন এড়ানো যায় না বলেই দেয় না। কল্পনাতীতকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাই শব্দের ভিন্নজগতের দিকে চাওয়া, যাওয়া এবং পাওয়া। স্বপন তাই শব্দের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকে ভুলে শ্রুতিগ্রাহ্য অরূপের দিকে গেলেন। কেমন দেখলাম নয়, কেমন শুনলাম শব্দকে। ফলে অনুভূতি তার প্রাথমিক অবস্থান থেকে অসীমের দিকে, অভেদের দিকে যাত্রা শুরু করল। সেখানে—

সব কোণেই
আঙুল তোলা নিষেধ।

এই প্রাথমিক অনুভূতি এবং সর্বশেষ ছাপার অক্ষরে উপস্থাপনা— এর মধ্যে কোথাও কোনো সংকট, এমন কি দ্বিচারিতা থেকে যেতে পারে কি? কখনোই পারে না। পারে না, কারণ কবির দেখা এবং অনুভূতির মধ্যে কোনো ফাঁক ছিল না, ফাঁকি ছিল না। ফলে যাত্রা ছাড়া কোথাও কিছু নেই। সেই যাত্রায় পাঠক কবির কো-প্যাসেঞ্জার হতেই পারেন। কবির এঁটো তাঁকে খেতে হবে না।

শব্দের উৎসব ঃ ধ্বনির বড়লোকি

স্বপন রায় তাঁর দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম বইতে যা করেছিলেন, তা হল— নিজেকে কবির সিংহাসন থেকে টেনে নামালেন পাঠকের সমতলে। পাঠক নিরপেক্ষ ভাবেই সেটা হয়, কারণ তখনও যে কোনো পাঠককে আসতে হয় স্বপন রায়ের কাছেই। তবে কলিংবেল না বাজিয়ে সে ঢকতে পারে কয়াশায়. কেবিনে।

আসলে একটা চেয়ার যা. একটা খাতা অথবা কলম. যা— কবির কাছে একটা শব্দ তার চেয়ে

বেশি কিছু। সে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু নয়, কিন্তু জ্যান্ত। ভাষাকে, শব্দকে যদি স্রেফ ভাষা এবং শব্দই ভাবা হয়, আমরা কি কল্পনাতীতকে পেতে পারি, পাওয়াতে পারি? কবিকে ঈশ্বর যেমন মনে হয় না, কেরানিও মনে হয় না। আমরা তাকে মানুষ ভাবি তখন। তাঁর ব্যবহৃত শব্দ সন্দর নয়. কিন্তু সেই শব্দের গাড়ি আমাদের সুন্দরে নিয়ে যায়। পরে স্বপন রায় লেখেন—

ফল ফটলো এমন যে ফুটে উঠলো
ডিমের ফার্স্ট সিন (স্বর্গের ফোকাস)

এখানে আমরা ফুলের ডিমকে পেলাম, সুন্দরকে ছুঁলাম— তা এমন করে বলা বলেই হলো। খুব সংস্কারহীনভাবে ব্যবহার করা হলো 'ফার্স্ট সিন' অভিব্যক্তিটিকে। সাবলীলতা কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হলো না।

আগেই বলেছি, শব্দ জ্যান্ত। সে প্রাণহীন নয়। সে নিজেই কবিকে তার অন্য দিগন্ত দেয়। অন্য যাত্রা দেয়। কুয়াশা কেবিনের মধ্য দিয়েই আমাদের স্বর্গের ফোকাসে ডিমের ফার্স্ট সিন দেখতে আসতে হবে। 'কুয়াশা কেবিনে' স্বপন রায় লিখেছিলেন—

সব বুকের ভেতরে হাস্নাই
থরো-বিষাদ
সে ভোর হয় তো সকাল
ইউনিফর্ম পরা বাচ্চাদের

আমি বলতে চাইব, 'কুয়াশা কেবিন' বাংলা কবিতায় স্বপনের ভোর ছিলো. আমরা এখন সকাল অবধি এসেছি। রোদ ওঠার পরে। পরেই মেঘান্তারা।

কিছু লাইন তুলে দিচ্ছি 'কুয়াশা কেবিন'-এর আদল চেনাতে—

১) পাহাড়ের ব্যাখ্যা ভিজছে
২) বিকেল মাপা রোদ
৩) যদিও পৃথিবীর সবচেয়ে বড গ্রাম/ যন্ত্রণার চেয়ে/ অনেক বড দীর্ঘ ঈ
৪) নদীজান তুললো পানীয়
৫) চোখ থেকে সর তুলে নেয়া অপেক্ষা
৬) মেঘাসিনি আবার সরিয়ে দিচ্ছে ট্রপিক্যাল রেললাইন
৭) জলোরা অন্তরীপ/ জলোরা পারফিউম
৮) হৃদয় তটানো একেকটা ঢেউ/ চার্চ সকালের স্কুল
৯) নদীর সিঁড়িতে বসে থাকা রোদ জুতোয় রং করে দিল
১০) আঙুল পিষে ফেলছে ফলমোডা টেবিল

কিছু শব্দ যারা ব্যবহৃত হতে হতে শুয়োরের মাংস নয়—

রুহ্শ্বাস, আলোমি, আপেলা, টহলসীমা, ফল্মদ, ডানালু, হাঁসকোড, জলোরিঝিম, কক্ষশোঁকা, রাতাররাত, কুসুমিয়া, মালাবানু, পুকুরালি, নার্সতোয়া, সারাগ্রুপ, আহুলিওয়ালা, তিত্লিভরণ, আভাস্কার্ট. ময়ীঝোঁক. তিরি-কোণ. একছাপ. কারমেল. মগটান. আখতামোভা. তাপজর. ভাষাটিপ

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, কেন এই শব্দগুলো? প্রশ্নটাই উত্তর। 'কুয়াশা কেবিন' এই শব্দগুলো বাংলা কবিতাকে দিয়েছে। অন্য কোনো কবিকে কি দিয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর দেবে আগামী পরিসর। ইতিমধ্যেই কি দিচ্ছে না উত্তরের আভাস?

'নতুন কবিতা' পত্রিকার জানয়ারি— সেপ্টেম্বর '০৭ সংখ্যায় তরুণ কবিদের এই সব লাইন পাচ্ছি—

১) সরোগেট খাতার আস্ফালন
২) দেখছি টাইপিস্ট বালিকাফড়িং
৩) যেন ধাক্কা নেই তবুও সুরের স্রোতে বাজছে অনাহত
৪) বাড়তি অতিথি পাতে নিজস্ব টেম্পারেচার বিসর্জন
৫) আদরমাখা থার্মোমিটারে নিয়ে আসছো ম্যাজিক

আমার বিনীত প্রশ্ন ঃ 'কুয়াশা কেবিন' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৯৫ সালে না বেরোলে এই পংক্তিগুলি কি দেখতে পেতাম? আমি বলছি না এরা ভালো লাইন। আমি বলছি না এরা প্রথম শ্রেণীর কবিতা। শুধু বলছি ঃ স্বপন রায় তাঁর কিছু প্রাক্তন ও বর্তমান সহযাত্রীকে নিয়ে যে রাস্তায় হেঁটেছিলেন, সেই রাস্তায় হাঁটার লোক অনেক এখন পাওয়া যাচ্ছে। এটা 'কয়াশা কেবিন'-এর জয়। ক্যাম্পাস গ্রুপের জয়। নতুন কবিতার জয় তো অবশ্যই।

কিন্তু 'কুয়াশা কেবিন' বইটা কোথাও কেনার জন্য পাওয়া যাচ্ছে না। এটা আমাদের কোথাও না কোথাও একটা পরাজয়। বাংলা কবিতা পারে একটি প্রয়োজনীয় কাব্যগ্রন্থকে বারো বছরে দুষ্প্রাপ্য করে দিতে। সেটাতে অবশ্য আমার এই সবিধা হলো যে আমি বইটা নিয়ে লিখতে পারলাম 'ছাপাখানার গলি'তে। সে যাক।

'কুয়াশা কেবিন' কি প্রতিকবিতা?

প্রতিকবিতা কাকে বলে আমি জানি না, সেটা হতেই পারে।

মাটিকে বিপন্ন না করে নদী তার খাত বানাতে পারে না। কোনো কবিই চান না কবিতার বিপ্রতীপে দাঁড়াতে, কবিতার বিরুদ্ধাচরণ করতে। নদীর স্রোতকে আটকাতে কোনো কবিই চান না। নদীর বাঁক বদল করতে অবশ্যই চান।

যারা গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে চলেছেন, তাঁদের কাছে সেই বাঁকবদলের নামই প্রতিকবিতা। ওরা কবিতা লেখে না, ওরা কবিতা লিখতে পারে না, ওসব কবিতাই নয়— এইসব বলে তাঁরা নিজেদের নিরাপদ করতে চান। নিরাপদ ভাবতে চান।

স্বপন রায় 'কুয়াশা কেবিন'-এ প্রতিকবিতা লেখেননি। তিনি বাংলা কবিতার সনাতন ধারাকে বিপন্ন করেননি, তাকে ভিন্নপথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন মাত্র।

'কুয়াশা কেবিন' আগাগোড়া পড়ে কেউ যদি বলেন, এই কবিতায় চর্যাপদ থেকে শুরু করে চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ ... এঁদের কেউ কোনোভাবে বিপন্ন হয়েছেন, অপমানিত হয়েছেন— আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে রাজি আছি। সেই তর্কে আমার কোনো ভয় নেই। আমি হারবো না।

অতিচেতনা ও কল্পনাতীত

বারীন ঘোষাল কথিত অতিচেতনার ধারণার স্বপন রায় কর্তৃক প্রথম প্রয়োগ হয়তো অনেকে বলবেন 'কুয়াশা কেবিন'-কে। আমাদের আপত্তির কিছু সেভাবে নেই। চেতনার আনন্দ ছলছিল সম্প্রসারণ আমরা পাই এই কাব্যগ্রন্থে। কিন্তু আমার মনে হয় ঃ ক্যাম্পাস গ্রুপের (অলোক, ধীমান, রঞ্জন, স্বপন, প্রণব, রতন) মধ্যে স্বপন রায়ের একটি স্বাতন্ত্র হল তাঁর আনন্দিত থাকার রোমান্টিকতা ও কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য। স্বপন রায়ের কবিতার মূল শক্তি হলো মাটি থেকে এক ইঞ্চি উপরে ভেসে থাকার ক্ষমতা। কল্পনাশক্তিই তাঁর মূল অস্ত্র। এই অস্ত্রেই তিনি খারিজ করে দেন অনুভূতি ও উপস্থাপনার মধ্যবর্তী কোনো ফাঁকির সম্ভাবনাকে। ফাঁকি না থেকে ফাঁক হয়ে ওঠে প্রসবপ্রয়াসী।

স্বপন রায়ের জগৎকে আমি চেতনোত্তর বলবো না, বলবো কল্পনাতীত। এখানেই তিনি নতন কবিতায় তাঁর নিজের স্থান পেয়ে যান। 'কুয়াশা কেবিন'-এর একটি কবিতা তলে আনছি

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা
তৈরী হল টেলিফোনের ফেরী
নূপুর গলানো ক্ষীর তোর প্রসাধনের লহরা
বেজে উঠলো অমৃত-কলা
আকাশের তাপ্পি ছিঁড়ে টেবিলক্লথের ফল আর আমি
সেই নির্জন রিং শুনলাম
মনে হল, এই সত্য চার্বাক নয়
তাই চমকে উঠলো আগুন-মণি ফুল
সেই ফুল যা খেলে ভালো লাগে রাত জাগতে হয়
ফুলের ছাপ লাগে সূ লতায়, তালতে. সীমান্তের ওপারে
নিম-ফোয়ারা আর ঝুম-ফোয়ারা
দুজনে কামড়ায় যেন শিশু, বিছের মত সাঁতরে তলপেটের ইতি
আর জিন্দাবাদ ধাঁচের শব্দগুলো অফরন্ত ট্রেনের বলে যাওয়ার
আসার শব্দে
গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে

এই কবিতায় পর্যবেক্ষণ একটা বড় ব্যাপার হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেখান থেকে আসছে অভিজ্ঞতা, একই সঙ্গে সাময়িক ও শাশ্বত। তারপর আসছে অভিজ্ঞতাকে না এড়িয়ে পেরিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ । অভিজ্ঞতাকে পেরিয়ে যেতে চেতনা যথেষ্ট নয়। চেতনার চেয়ে বেশি কিছু চাই। তাকে বারীণ ঘোষাল বলেছেন অতিচেতনা। এই অতিচেতনার ধারণা আর কিছু না হোক, বাংলা কবিতায় কলোনিয়াল হ্যাংওভার কাটিয়ে উঠতে প্রচুর সাহায্য করেছে। এই ধারণা হয়তো পোস্টমডার্ণ ততটা নয়, যতটা প্রি মডার্ণ বা প্রাক ঔপনিবেশিক। চর্যাপদ থেকে রামপ্রসাদ পর্যন্ত যে আদি বাংলা কবিতার ধারা— তাকে এটা ধরতে পেরেছে। বারীণ ঘোষাল, ধীমান চক্রবর্তীর কবিতা এই পরিসরে চমৎকার মানিয়ে যায়। মানিয়ে যান জহর সেন মজুমদার, প্রথমের দিকে মুরারি সিংহ। স্বপন রায়ও এখানে রবাহুত নন. তাঁরও এখানে ঘরবাড়ি আছে. কিন্তু তাঁর কল্পনাশক্তির

ঐশ্বর্য তাঁকে অন্যতর প্রস্থান দেয়। তার সঙ্গে যক্ত হয় তাঁর আনন্দিত থাকার ইচ্ছার চেয়েও বেশি করে খুশি থাকতে চাওয়া।

কল্পনার শক্তিতে স্বপন রায় পেরেছিলেন বিভিন্ন আপাত বিপরীত উপাদানের মধ্যকার ফাঁকটিতে খুশির হাওয়া লাগিয়ে দিতে। উপরের কবিতায় এই উপাদানগুলো হল— টেলিফোন/ ফেরি, অমৃত / তাপ্পি, আকাশ/ টেবিলক্লথ, নূপুর/ক্ষীর, নিম-ফোয়ারা/ ঝুম ফোয়ারা, জিন্দাবাদ/ ট্রেনের শব্দ, (কল্পনার) সীমান্তপার/ গ্রামগঞ্জ/ এদের মধ্যকার সম্ভাবনা কবির কলমের ছোঁয়ায় খুশিয়াল হয়ে উঠল। কবির কল্পনার শক্তিতে কবিতাটি হলো. ওয়ার্ডস ওয়ার্থের ভাষায়— স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলনবিন্দুটির প্রতি সত্যময়।

'কুয়াশা কেবিন' থেকে তা হলে ...

'কুয়াশা কেবিন' একটি কাব্যগ্রন্থ। একটি জ্যামিতিক অস্তিত্ব। তার মধ্যে স্বপন রায়ের কবিতাগুলি আছে। সেই কবিতাগুলির প্রাণবীজ শূন্য দশকের অনেক কবিতায় অঙ্কুরিত দেখতে পাচ্ছি। কেউ জেনে করছেন, কেউ না জেনে। এতে ক্ষতি কিছ নেই। নতন কবিতা এগোচ্ছে। একদিন তাকে নতনতর হতেই হবে।

এর মধ্যে 'কুয়াশা কেবিন' বইটা কোথাও কেনা যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না।

বইটা দষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। কারো কাছে বারো বছর। কারো কাছে একটি যগ।

ফিনিক্স

সম্পাদক: গৌতম সাহা

দপ্তর :

জ্যোতি নিবাস. লেনিন সরণী. কাটোয়া. বর্ধমান-৭১৩১৩০

ফোন : ৯৭৭৫১৬৯২৮৮

কবিতা. গল্প. নিবন্ধ পাঠান

গুরুত্ব সহকারে লিটল ম্যাগাজিন আলোচনা করা হয়।

অনাবিল মমতায় ভলে যাওয়া ইতিহাসের উন্মোচন

নাসিম-এ-আলম

আমার সামনে বইয়ের আলমারি। রাশি, রাশি বই। সবই পরিচিত লেখকের। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর। কোথাও জীবনানন্দ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, লাইব্রেরি ভরতি অজস্র গোয়েন্দা কাহিনী, ভূতের গল্প, উপন্যাস। ইদানিং একটু ভিন্নস্বাদ পেতে আলালের ঘরের দুলাল কিংবা হুতোম পেঁচার নাকশা, অথবা একট স্বাধীনতা. দেশভাগ. কান্নাকাটি ইত্যাদি করে ঐ শামসর বা হুমায়ূন আহমেদ অবধি।

সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী যারা নম্বরের জন্য. সিলেবাসের বাধ্যবাধকতায় একট চর্যাপদ. মঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী ...।

আমাদের বাংলাভাষা কিন্তু বন্ধ্যা নয়। তার ফুল ফসল নানাবর্ণ, গন্ধে ছড়িয়ে দিচ্ছে হাজারো বিভা, বাঙালি পাঠক খুঁজে পাননি তাদের। কারণ একটিই আমাদের ভাষার সাহিত্য চিরকাল এক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক। প্রতিষ্ঠানের নাম বদল হয় কিন্তু চরিত্র বদল হয় না। তাই একদশকে গুটিকয়েক লেখক, কবি ছাড়া বাকিরা আড়ালে চলে যান। প্রতিষ্ঠানের দাক্ষিন্যপ্রাপ্তরা সকলে যে আহামরি লেখক এমন নন। তবু বারবার প্রচারে একটা পরিচিতি হয়ে যায়। ইদানিং সময়ে পাল্টেছে। যোগাযোগের সুবিধা এবং নানান ধারার কিছু ভালো লিটলম্যাগাজিন এবং প্রকাশনা সংস্থা ভিন্নমাত্রায় একটা লড়াই চালিয়ে কিছু যোগ্য ও প্রতিভাবান লেখককে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছেন।

কিন্তু সেতো বিগত কুড়ি বছরের গল্প। পিছনে তারও একশো বছরের যে লেখালেখি যে নির্জন লেখক তাকে মা-মাটি-মানুষের কাছ থেকে আবিষ্কার করবেন কে? মনে হয় সে দারিদ্র্য আমাদের সকলের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কিভাবে আবিস্কৃত হয়েছে নিশ্চয় মনে আছে। এমনভাবে সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে সুন্দরবন এবং পুরুলিয়া থেকে মুর্শিদাবাদ অবধি আড়ালে. গোপনে কতনা দস্প্রাপ্য, মূল্যবান সব সৃষ্টি ছড়িয়ে রয়েছে কে তার হিসাব রাখে।

এপার বাংলার বসে যেমন আমাদের আলোচনা ও ভাবনার বাইরে রয়েছেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, তাঁর 'প্রাচীন বাংলার পুথি গ্রন্থে' তিনি ৮৫ জন বাঙালি মুসলমান কবির সন্ধান দিয়েছেন যারা বাংলাভাষার উদ্ভবের পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্য সময়ে বাংলা ভাষার সেবা করে গেছেন। অনার্স, এম.এতে পাঠ্য হবার পর সৈয়দ আলাওল এবং দৌলত কাজীকেই বা কতটা মনে রেখেছি আমরা?

আমার সংগ্রহে রয়েছে এম আবদুর রহমান লিখিত 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা' নামক দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ। প্রায় ১২০ পৃষ্ঠার বই। প্রকাশক প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সি, কলিকাতা। গ্রন্থের বিষয় আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে। প্রলব্ধ করেছে রচনার গভীরে যেতে। সেখানে ঘুমিয়ে আছে ইতিহাস। সঙ্গে দেশ কাল, সমাজ।

এম আবদর রহোন পেমায় আইনজীবী। জন্ম ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১৪ ভাদ্র। বীরভম জেলার

নানুর থানার অন্তর্গত নিমড়া গ্রামে। ছাত্রজীবনে জড়িয়ে পড়েন স্বাধীনতা আন্দোলনে। পরে নজরুল ইসলামের লাঙল পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। তৎকালীন মোসলেম ভারত. সওগাত. কোরানপ্রচার, অধুনালুপ্ত কাফেলার সঙ্গে রহমান সাহেবের যোগাযোগ ছিল নিবিড়।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা পরবর্তী মুসলমান কবিদের কবিতা নিয়ে 'বল্লরী' কাব্যসংকলন প্রকাশ করেন। যেখানে সৈয়দ মুজতবা আলী. হুমায়ন কবির থেকে সে সময়ের কলেজছাত্র কবিরুল ইসলামের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

আলোচিত গ্রন্থ 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা'য় নয়জন স্বাধীনতা সংগ্রামী মহিলার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এঁরা হলেন— (১) রাণী লালবিবি (২) সেবাব্রতী বৌদাদী (৩) বেগম হজরত মহল (৪) বীর জননী বি-আম্মা (৫) রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (৬) বেগম করিমুন্নেসা (৭) মিসেস এম রহমান (৮) বেগম দৌলত উন্নিসা (৯) হোসেন আরা বেগম।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ভারতীয় সংখ্যালঘু সমাজ স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। রহমান সাহেবের গবেষণা ধর্মী পুস্তক হতে জানতে পারলাম সংখ্যালঘ সমাজের পরুষরা কেন মহিলারাও স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন।

পলাশীর যুদ্ধে পতনের পর মুর্শিদাবাদে নবাবী শক্তি নিশ্চিহ্ন হবার মুখে তখন বীরভূমের রাজা আসাদুজ্জামান ও তাঁর রাণী লালবিবি ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছেন। রাজার মৃত্যুর পর আরও তিনবছর লালবিবি বীরভূমের শাসনকার্য চালিয়েছিলেন। উল্লেখকরি বীরভূমের এই রাজপরিবারটি তৎকালীন ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহে সাহায্য করেছিলেন।

বিস্মিত হয়েছি বীরজননী বি-আম্মার জীবনী পড়ে। সক্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী এই মহিলা সরোজিনী নাইডু ও অ্যানি বেসান্তের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বি-আম্মার তিনপুত্র ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক। তাঁরা হলেন জুলফিকার আলি, শওকত আলি, মোহাম্মদ আলি। এঁরা মহাত্মাগান্ধীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই— 'দেশনেতা বালগঙ্গাধর তিলক বি-আম্মার উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন, 'এ দেশে যেন বি-আম্মার মতো বীর জননীর অভাব না হয়। জননী হওয়া গৌরবের বটে, কিন্তু বীরজননী হওয়া অধিকতর গৌরবের। দেশকে আজাদ করতে হলে বি-আম্মার মতো হাজার হাজার বীর জননীর প্রয়োজন।''

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন লেখিকা হিসাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বেশ সুপরিচিত ছিলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রংপুর জেলার বায়েরাবন্দ গ্রামে (অধুনা বাংলাদেশ) তাঁর জন্ম। কলকাতার বিখ্যাত সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাত্র আট জন ছাত্রী নিয়ে ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ কলকাতার ওলিউল্লাহ লেনে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং রচনারীতির দিক থেকে উত্তীর্ণ। মতিচুর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ছাড়া রোকেয়া সাখাওয়াৎ পদ্মরাগ ও অবরোধবাসিনী নামে দুটি উপন্যাস রচনা করেন। অজস্র প্রবন্ধ ও ছোটগল্প লেখিকার সাহিত্যকীর্তি হিসাবে সে সময়ের পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। এম আবদুর রহমান অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে নানা তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশিত করেছেন। যেমন ভাগলপরের তদানীন্তন কমিশনার মিঃ ম্যাকফারসন সাহেবের চিঠি। রোকেয়া সাখাওয়াতের কাব্যগ্রন্থ Sultanas Dreams পড়ে ম্যাকফারসন সাহেব লেখেন— "We consider it a most charming little composition. The ideas expressed in it are quite delightful and full of orginality and they are written in purfect english."

উল্লেখ করার মতো তথ্য আরও রয়েছে যেমন রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের মৃত্যুর পর সে সময়ের মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যাটি বেগম রোকেয়া স্মরণ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করে। মোহাম্মদীর সম্পাদক ছিলেন মণীষী মওলানা আকরাম খান।

এম আবদুর রহমান সারাজীবনে ২৪ টি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তার প্রায় সবগুলি দুষ্প্রাপ্য এবং দূর্মূল্য। ভাবনার গভীরতা রহমান সাহেবকে নিয়ে গেছে ইতিহাসের গভীরে। রূপকথার কল্পনামূলক কাহিনী নয় প্রকৃত সত্যের কাছ থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন মৌলিক রচনার রসদ। বিস্মরণ ও উপেক্ষা আমাদের জাতীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। তাই আমরা লেখককে প্রকৃত সম্মান জানাতে পারিনি। এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গ্রন্থগুলি প্রকাশের পর'ও আমাদের সাহিত্য পত্রিকা ও দৈনিক পত্রিকাগুলি নীরব থেকেছে। দ-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোথাও কোন আলোচনা প্রকাশিত হয়নি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরঙ্গনা' পাঠ না করলে জানতেই পারতাম না বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থ যাকে উৎসর্গ করেছিলেন সেই মিসেস এম রহমান নিজেও একজন লেখিকা ছিলেন। নজরুলকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহে পালন করেছিলেন। তৎকালীন সওগাত, বিজলী, ধূমকেতু পত্রিকায় মিসেস রহমানের লেখা সম্মানের সঙ্গে ছাপা হতো। লেখিকার দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি হল 'মা ও মেয়ে' এবং 'চানাচুর'।

বইটির শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে দেশপ্রেমিকা হোসেনে আরা বেগমের কথা। ''১৯৩২ সালে স্বাধীনতা দিবসে কলিকাতা ময়দানে শোভাযাত্রা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় কবি হোসনে আরা বেগমের উপরে। বলা বাহুল্য তখন কবি তারুণ্যের অগ্রনায়িকা রূপে সম্মানিতা। সভা ও শোভাযাত্রা পরিচালনা করা ছিল তখনকার দিনে শুধু বে-আইনি নয়। বিপজ্জনকও। ... এল পুলিশ, এল স্বেচ্ছাচারী সরকারের সশস্ত্র বাহিনী, ধত হলেন কয়েক শত যবক এবং যবতী আর সেই সঙ্গে তাঁদের নেত্রী হোসেন আরা বেগম।''

রহমান সাহেব লিখিত একটি গ্রন্থ অনেক ভুল ধারণা পালটাতে সাহায্য করবে। ইতিহাসের স্থান, কাল পাত্রের নির্ভুল চয়নে স্বীকার করতে হবে যে স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলিম মহিলাদেরও অবদান রয়েছে। সেইসঙ্গে তাঁরা সাহিত্যচর্চাও করেছেন করেছেন, সমাজ সেবা।

আমাদের যৌথ জীবনের সফলতার জন্য এম আবদুর রহমানের এই প্রয়াস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বইটি পনমদ্রিত করে প্রচারের আলোয় আনলে আমাদের বাঙালী সমাজ উপকত হবেন।।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মসলিম বীরাঙ্গনা
এম আবদুর রহমান
প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সি
৮ বি কলেজ রো কলিকাতা – ৭০০০০৯
মূল্য : চৌদ্দ টাকা
প্রচ্ছদ : অজিত মখোপাধ্যায়

বসন্তের রেশমগুটি

সজয় বিশ্বাস

১৯৯৬-এর মার্চ কি এপ্রিল মাসে বোল পুরের 'সুবর্ণরেখা' থেকে এই দুষ্প্রাপ্য বইটি কিনে ছিলাম। মাও তুন-এর 'বসন্তের রেশমগুটি। পুরোনো বই, দাম পড়েছিল দশটাকা। প্রকাশক নিউ বুক সেন্টার (কলকাতা): ইংরেজী থেকে অনবাদ করেছেন অবন্তী সান্যাল: ১৯৮১-তে প্রথম বাংলা সংস্করণ।

২২৩ পাতার এই বইটিতে গল্পের জন্য আছে ২১১ পাতা, লেখক পরিচিতি ১ পাতা আর মূল্যবান একটি সম্পাদকের কথা।' সংকলিত গল্পগুলো হল— বসন্তের রেশমগুটি, শরতের ফসল, শীতের সর্বনাশ, সংক্ষিপ্তসার, লিন পরিবারের দোকান, যুদ্ধের কাল, নাকু, দ্বিতীয় প্রজন্ম, মিঃ চাও-এর বিভ্রান্তি, এক খাঁটি চীনা দেশপ্রেমিক, ব্যর্থতা বোধ, অফিসে প্রথম দিন এবং জলাভূমি অঞ্চল। রচনাকাল ১৯৩০-৪৩। এই ১৩ টি গল্পের মধ্যে মাত্র চারটি গল্প নিয়ে আমি এই লেখাতে কিছু বলতে চাই। প্রথম তিনটি গল্প থেকে চীনের গ্রামীন অর্থনীতির পতন ও বিপ্লবী আন্দোলন বিকাশের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে আর চতুর্থ গল্পটি থেকে সংহাইতে জাপানী আক্রমণের সম্পর্ক কিছু ধারণা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে যাবার আগে লেখক মাও তন-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার।

তিক্ত শ্লেষের কালিতে কলম ডুবিয়ে

মাও তুন আধুনিক চীনের একজন মহান ঔপন্যাসিক, কমিউনিস্ট আদর্শবাদী ও সম্পাদক ছিলেন। জন্ম ১৮৯৬ সালে, চেকিয়াং প্রদেশের তুশিয়াং-এ আসল নাম শেন ইয়েন-পিং। ছাত্রদের পত্রিকা 'জুয়েশেং জাঝি' তে তাঁর প্রথম দিককার লেখালেখি প্রকাশিত হয়। ২৪ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি একজন সম্ভবনাময় লেখক হিসেবে চীনা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯২০-তে তিনি অন্যান্য কয়েকজন সাহিত্যিকের সাথে 'জিয়াওশুও উয়েবাও' বা 'উপন্যাস' পত্রিকার দায়িত্ব নেন এবং তাতে তলস্তয়, চেখভ বালজাক, ফ্লবেয়র, এমিল জোলা, শেলী, কীটস্, বায়রন প্রমুখের লেখা প্রকাশ করতে থাকেন। এই সময়েই তাদের নতুন সাহিত্যতত্ত্ব গড়ে ওঠে। শেন ইয়েন পিং চীনের তখনকার শাসকশ্রেণী সামন্তপ্রভু আর মু'সুদ্দি বুর্জোয়াদের সাহিত্যকে অবিরাম আক্রমণ করতে থাকেন। ১৯২৬-২৭ সালে তিনি হ্যাংকাউ থেকে প্রকাশিত বিপ্লবী দৈনিক 'মিনকুও জিপাও' পত্রিকার সম্পাদক।

১৯২৭ সালের এপ্রিলে চিয়াং কাইশেক ক্ষমতা দখল করার পর কমিউনিস্ট কর্মী সহ সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের ওপরে কঠোর অত্যাচার নেমে আসে (অনুগ্রহ করে এখনকার সরকারী 'কমিউনিস্ট'দের সাথে তখনকার বিপ্লবী কমিউনিস্টদের মেলাবেন না। চীনের ক্ষেত্রেও নয়, ভারতের ক্ষেত্রেও নয়)। শেন ইয়েন-পিং হ্যাংকাউ ছেড়ে সাংঘাই চলে যান এবং তখন থেকেই

'মাও তুন' ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেন। —তার সেই সময়কার লেখাগুলোতে চীনের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মানসিক সংকটকে তুলে ধরা হয়েছে। এই বুদ্ধিজীবীরা সমাজ পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও বিপ্লবের উত্তাল ঢেউয়ে সামিল হয়েছিল। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত 'রামধনু' উপন্যাসে একটি মেয়ের কথা বলা হয়েছে, যে সাংহাই-এর ১৩ই মের বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য তার বুর্জোয়া পরিবার থেকে বেরিয়ে আসে। 'মধ্যরাত' উপন্যাসটি তাকে চীনের পাঠক সমাজে ব্যাপক পরিচিতি এনে দেয়। সাহিত্যে বিপ্লবী বাস্তবতার উন্মেষের ক্ষেত্রে এই উপন্যাসটির অবদান অনেক। ১৯৩৭ সালে জাপ-আগ্রাসন-বিরোধী যুদ্ধের সময় ও তার সাহিত্যসৃষ্টি ছিল অব্যাহত। একই সময়ে তিনি সম্পাদনা করেছেন 'সাহিত্যিক মোর্চা' নামক বামপন্থী লেখক সাহিত্যিকদের পত্রিকা। মাও তুন-এর এই সময়কার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা হল 'অবক্ষয়' (উপন্যাস, ১৯৪১), 'তুষার পীড়িত ম্যাপল পাতা বসন্তের ফলের মতো লাল' (উপন্যাস. ১৯৪২) এবং 'ছিংমিং পরবের আগে ও পরে (নাটক, ১৯৪৪)।

১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি সংস্কৃতি মন্ত্রী ও মাও-সে তুং এর সচিব হিসেবে কাজ করেন ১৯৬৪ পর্যন্ত। এই সময়েই তিনি Chinese Literature নামক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন, পাশ্চাত্যের পাঠকদের কাছে যা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৮১ সালের ২৭ মার্চ মৃত্যু পর্যন্ত তার 'স্মৃতিকথা' অবশ্য অসমাপ্তই থেকে যায়। আলোচ্য বইটির 'সম্পাদকের কথা'য় বলা হয়েছে, 'মাও তুন তিক্ত শ্লেষের কালিতে ডোবানো কলম চালান দক্ষতা ও তেজের সঙ্গে। চীনের প্রাচীন সমাজের পাপের স্বরূপকে নির্মমভাবে উদঘাটন করে তিনি যন্ত্রনা ভোগ করেন, সংগ্রাম করেন পীড়িত ও শোষিতদের সঙ্গে, বজ্রকণ্ঠে তাদের ডাক দেন সক্রিয় হতে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যকার দিনগুলোতে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ এবং চিয়াং কাইশেকের সন্ত্রাসের রাজত্ব সত্তেও বিপ্লবী শক্তিগুলো লড়াই করছিল। সেই লড়াইয়ের একজন সক্রিয় অংশীদার মাও তুন।'

এবার গল্পের কথায় আসা যাক।

এক মাসের খিদে আর না ঘুমানো বৃথা রাত্রিগুলোর যন্ত্রনা ...

আমি যে চারটি গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চলেছি সেগুলো লেখা হয়েছে ১৯৩২-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৩-এর জুলাইয়ের মধ্যে। প্রথম তিনটি গল্প মিলে একটি ত্রয়ী (trilogy) যার শুরুতেই আছে 'বসন্তের রেশমগুটি'।

বুড়ো তুং পাও-এর পরিবারে সদস্য সংখ্যা পাঁচ। বুড়োকে বাদ দিয়ে বাকি চার জন হল তুং পাও-এর বড় ছেলে আ সে, ছোট ছেলে আ তো, বড় ছেলের বৌ এবং আ সে-র ছেলে ১২ বছরের খুদে পাও। বুড়ো তুং পাও ধনী চাষীর বংশধর, চিন্তাভাবনা সামন্ততান্ত্রিক ভুস্বামীদের মতোই; কিন্তু তার অবস্থা যথেষ্টই খারাপ। তার নিজের কোনো জমি নেই, তার ওপর ধার আছে তিন শ' ডলারেরও বেশি। ধারদেনা করে রেশম চাষ চলে তাদের। পুরো পরিবার, গ্রামের আর সকলের মতো, দিন-রাত এক করে খাটে আর খাটে, কিন্তু তাদের ঋণের বোঝা আর কিছুতেই হালকা হয় না। বুড়ো ভাবে, সবই সেই আকাশের দেবতার হাতে; কিন্তু অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। তাদের অবস্থা পড়ে যাওয়ার জন্য 'বিদেশী শয়তান' আর কওমিনতাং-এর ষড়যন্ত্রও কম দায়ী নয়।

বসন্তকালে সবাই আশা নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। এক মাসের মধ্যে তঁত গাছের সবজ

পাতাগুলো বরফের মতো সাদা গুটিপোকা হয়ে উঠবে; সেগুলো বিক্রি করে ঘরে আসবে টুং টাং আওয়াজ করা রুপোর ডলার; প্রতিদিন চেপে বসা ঋণের বোঝা তাতে হালকা হবে; গুটিপোকার ফলন যদি ভালো হয় সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। লেখকের বর্ণনা অনুসারে— 'মেয়ে বা বাচ্চাদের কেউই দেখতে সত্যিকারের সুস্থ সবল নয়। বসন্ত শুরু হওয়া থেকে তারা আধপেটা খেয়ে আসছে; পরনের জামা-কাপড় পুরোনো ছেঁড়াখোঁড়া। বলতে কি তাদের হাল ভিখিরির চাইতে ভালো নয়। তবু সবাই রয়েছে খোসমেজাজে, বুক বেধে আছে অসীম ধৈর্যে আর বিপুল মোহে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, ভালো ফসল হলেও পরিণতি হল খুবই খারাপ। চাষাবাদের শেষ দিকে তুঁত পাতার দাম বাড়ল চড়চড় করে— তাতে নতুন করে কিছু ধার হল। ফসল ওঠার পর দেখা গেল আশেপাশের সব রেশমের কারখানাই বন্ধ। গুটির পাইকাররা গ্রামে আসছে না, তাদের বদলে আসছে মহাজন আর সরকারী ট্যাক্স আদায়ের লোক। বাধ্য হয়ে গ্রামের অনেকে গেল দুরের এক রেশম কারখানায়; পাঁচ দিন পর ফিরে এলো; পরাজিত ও হতাশ। সেখানে তারা যা দাম পেয়েছে তাতে পথ খরচ ও ধার দেনা শোধ করার পর হাতে আর কিছুই থাকে না। এদিকে ঘরের চাল সব ফুরিয়ে গেছে। তাই পেট চালাতে আবার নতুন করে ধার করতে হয়। গল্পটা শেষ হয়েছে এভাবে— 'বুড়ো তুং-পাও এর পরিবার তুলেছিল পাঁচ ডালা, পেয়েছিল গুটির চমৎকার ফসল। পরিনামে তাদের ধার করতে হল তিরিশ ডলার আর হারাতে হলো বন্ধক রাখা তুঁত গাছগুলো। এক মাসের খিদে আর না ঘমানো বথা রাত্রিগুলোর যন্ত্রনার কথা কিছ না বলাই ভালো।'

'আবার সেই কুমড়ো! সব সময় তুমি কেন কুমড়োই রাধো মা?'

শরতের ফসল গল্পটার শুরুতে আছে ভাতের জন্য হাহাকার।

বুড়ো তুং পাও গত চল্লিশ বছরের তিক্ত সংগ্রামে মাত্র দুটো জিনিসকে পুজো করে এসেছে— এক ঈশ্বর, বিশেষত ধনের দেবতা; দুই, তার স্বাস্থ্য। কিন্তু ধনের দেবতা তার দিকে মুখ তুলে চায়নি, আর শোকতাপে অনাহারে জিরজিরে একটা বাচ্চা বাঁদরের মতো। রোজ রোজ কুমড়ো সেদ্ধ খেতে খেতে সে হতাশ; মুখ বদলানোর জন্য একটু শাদা চালের ভাত চায়। চাল বাডন্ত: বড়ো তা জানে। নাতিকে দেখে তার চোখের জল বাগ মানে না।

অভাব অনটনের মধ্যে গ্রামের মেজাজ মর্জি ততদিনে বদলাতে শুরু করেছে। 'উড়ন চণ্ডী' আ তো আসলে কি করছে বুড়ো তা জানতে পেল গুনিন হুয়াং এর কাছ থেকে। 'জানেন দাদা, আমাদের গ্রামবাসীরা কোথায় গমন করেছে?' 'আরোপিত শুদ্ধ ভাষায় গুনিন তাকে জানালো 'তারা গমন করেছে ব্যবসায়ী এবং ধনীদের ধান্যগোলায় চড়াও হতে। গত পরশু পাইছিপিং-এর চাষীরা এটা আরম্ভ করেছে। আজ তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরন করছে আমাদের গ্রামের চাষীরা। আপনার মান্যবর কনিষ্ঠ বংশধরটি তাদের মধ্যে আছেন।' —খবর শুনে তুং পাও অবশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অনেক দিন থেকেই তার ভয়, তার ঠাকুর্দা যে 'লম্বাচুলওয়ালাটিকে মেরেছিলেন, তার আত্মাই আবার তং পাও এর বংশে জন্মেছে। গুনীন এর কথা শুনে সে বঝতে পারে সেই ভয় সত্যি হয়েছে।

এখানে 'লম্বা চুলওয়ালা'দের সম্মুখে কিছু বলা দরকার।

১৯ শতকের মাঝামাঝি সামন্ততান্ত্রিক চিং রাজত্বের বিরুদ্ধে চীনের নিপীড়িত চাষীরা এক বিপ্লবী অভ্যাখান ঘটিয়েছিল। ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘ (১৮৫১-৬৪) এই অভ্যাখান ঘটিয়েছিল।

ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘ (১৮৫১-৬৪) এই অভ্যুত্থানটি তাইপিং বিপ্লব নামে পরিচিত। চিং শাসনকর্তারা তাইপিং যোদ্ধাদের যেমন ঘৃণা করতো তেমনি ভয়ও পেত। কুৎসা করে নাম দিয়েছিল 'লম্বাচুলওয়ালা'। শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে এই বিপ্লবকে দমন করা হলেও জনমানসে সেই বিপ্লবী যোদ্ধারা দীর্ঘ দিন বেঁচেছিলেন।

মাও-তুন এর গল্প অনুসারে বহু দিন আগে তাইপিং জঙ্গিরা গ্রামাঞ্চলে অভিযান চালানোর সময় তুন পাও-এর ঠাকুর্দা এবং আরো এক জনকে পাকড়াও করে নিয়ে যায়; সাত বছর বন্দী করে রাখে। জঙ্গীদের আস্তানা থেকে পালাবার সময় তুন পাও-এর ঠাকুর্দা বাধ্য হয়ে একজন 'লম্বা চুলওয়ালা'কে খুন করে। বুড়োর আশংকা সেই বিপ্লবীই তার বংশে আ তো হয়ে জন্মেছে। (পাঠক মাত্রেই বুঝবেন, মাও তুন এখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে গ্রাম্য কুসংস্কার মিশিয়ে বিপ্লবের পুর্নজাগরণের প্রতীক হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। এরকম আরো কিছ গ্রামীণ সংস্কারের অর্থপূর্ণ প্রয়োগ আমরা দেখতে পাবো 'শীতের সর্বনাশ' গল্পটিতে।

বিপ্লবের প্রশ্নে তুন পাও য়ের মন স্বভাবতই সন্ত্রস্ত। সে মনে মনে ভাবে, বিপ্লবে যদি সত্যিই কোনো কাজ হত তবে অনেক দিন আগেই 'লম্বা চুলওয়ালা'রা চীনের সিংহাসন দখল করত। তা তো হয় নি। বরং সে দেখেছে সত্তর দশকে সম্রাট কুয়াং সু যখন সিংহাসনে বসেছেন, সারা দেশ জুড়ে কিভাবে কৃষক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে আর কিভাবেই বা মাঞ্চু সরকার দ্রুত ও নির্মমভাবে পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে; কত রক্তাক্ত মাথা ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে। তাছাড়া সে তো ঈশ্বর বিশ্বাসী! তার মতে 'গরীব হলেও মানুষকে ধার্মিক থাকতে হবে'। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোর অন্যায়। কিন্তু অভাবের তাড়নায় তার ছেলের বৌয়ের ঈশ্বর-ভক্তি ভেঙে খানখান। সে খেঁকিয়ে ওঠে বুড়োকে— কুমড়ো অন্তত ভাতের বদলে খাওয়া যায়: আর ধার্মিকতা— কমডোর থেকেও বাজে। খিদের সময় ওটা কোনো কাজেই আসে না।

তাই চালের গুদামে হামলার ঝড় ছড়িয়ে পড়ে। ভদ্রলোকেরা প্রথমে মন-ভোলানো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদ্রোহের গতি কমাতে চায়। কিন্তু সেই সব ভালো-ভালো কথায় চাষী পরিবারগুলোর পেটের জ্বালা মেটে না। ফলে, চাষীদের দলের সংখ্যা বেড়ে হয় হাজার খানেক। তুং পাওদের গ্রাম থেকে মাইল কুড়ি দূরের এক সমৃদ্ধ শহরে ক্ষুধার্ত চাষীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়; শূন্যে গুলি চলে; জনা তিরিশেক চাষীকে আটক করা হয়। এর প্রতিবাদে পরদিন হাজার হাজার ক্ষব্ধ চাষী সেই শহরটা ঘিরে ফেলে; বাইরের পৃথিবী থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

সরকার নড়েচড়ে বসে। ব্যবস্থা নেওয়া হয় দুরকমই। চাষীদের বিনা সুদে চাল ধার দেবার সাথে সাথে গ্রামের প্রধান রাস্তাগুলোয় সৈন্য মোতায়েন করা হয়। এদিকে চাষাবাদের মরশুম এগিয়ে আসতে থাকে; ফলে চালের গুদামে হামলা তখনকার মতো থিতিয়ে পড়ে।

এবারও ফসল হয় ভালো এবং পরিনামও সেই আগের মতোই। ফসল কাটার মরশুম শুরু হবার আগে থেকেই শহরে চালের দাম পড়তে থাকে। হিংস্র পঙ্গপালের মতো মহাজনরা গ্রামের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল ওঠে; শোনা যায় অভিসম্পাত। ভালো ফসল পেয়েও দেনার দায়ে চাষীদের চুল পর্যন্ত বিকিয়ে যায়। রেশম চাষের তিক্ত অভিজ্ঞতা তুং পাও-কে বিছানায় ফেলেছিল, এবার সে গেল কবরে। কিন্তু যাবার আগে সে তার বিপ্লবী ছেলের কাছে হার স্বীকার করে নিল— তাহলে তই-ই হক কথা বলে গেলি সব সময়! তাজ্জব! তাজ্জব! একথা কে বিশ্বাস করতে পারতো!'

মাটির প্রতিমার পায়ের নিচে উবু হয়ে বসে কাঁদতে লাগলো প্রকৃত সম্রাট।

প্রাচীন চীনের সংস্কার অনুযায়ী 'প্রকৃত সম্রাট' পুরোনো রাজত্বকে উচ্ছেদ করেন এবং জনগন তাকে নৈতিকভাবে সমর্থন করতে বাধ্য থাকে। শীতের সর্বনাশ' গল্পে মাও তুন এই মিথ্‌কে আমূল পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। গুনিন হুয়াং এবং গ্রামের মেয়েদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে 'প্রকৃত সম্রাট'-এর আবির্ভাব সম্পর্কে অনেক পূর্বানুমান উঠে আসে।

'প্রকৃত সম্রাট' সেখানে আবির্ভূত হবেন সেখানে দেখা দেবে 'রক্ত আভা'— অর্থাৎ অনেক মানুষ মরবে। যে জায়গা প্রকৃত সম্রাট সৃষ্টি করে তাকে তার দাম দিতে হবে প্রয়াত তুং পাও-এর গ্রামটি পড়েছে সম্ভাব্য রক্ত আভার মধ্যে। এখানে সকলের ঘাড়েই খাঁড়ার কোপ পড়বে। ক্ষমতাসীন সম্রাট এই গ্রামটাকে দুনিয়ার বুক থেকে ধুয়ে মুছে দেবে। (লাইফ হেল করে দেবে!) — তাহলে কি মুক্তি নেই?' প্রশ্ন করে একটি মেয়ে। 'কে বললে নেই?' উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে আক্রমনাত্মক ভঙ্গিতে বাধা দিল গুণিন হুয়াং— 'যারা শিকার হবে (অর্থাৎ শহিদ হবে) তাদের বদলি হিসেবে কাজ করার জন্য আমি তিন খড়ের পুতুলকে হুকুম দিয়েছি।'

'প্রকৃত সম্রাট'—এর আবির্ভাব নিয়ে যখন গ্রামের মেয়েদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা চলেছে; অনেকে ভাবছে আকাশ যদি সত্যিই আলোকিত হয়ে ওঠে, তিনি যদি সত্যিই পৃথিবীতে আসেন, গরীব মানুষরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে— ঠিক তখনই ভেঙে যাচ্ছে বুড়ো তুং পাও-এর পিতৃতান্ত্রিক পরিবারটি। আ সে-র বৌ যাবে শহরে, ঝিয়ের কাজ করতে; খুদে পাও কার কাছে থাকবে? এই সময়েই কয়েক জন জোয়ান ছেলে গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যায়।

দক্ষিনায়নের কয়েক দিন আগে গ্রামে গুজব রটে গেল, পাশের চিচিয়া খাঁড়ি গ্রামে প্রকৃত সম্রাট আবির্ভূত হয়েছেন। তার বয়স মাত্র বারো! সরকারী সাঁজোয়া বাহিনী অভিযান করলো সেই প্রকৃত সম্রাটের জন্মভিটায়, তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলো ধরিত্রী-মন্দিরে, তদন্তের জন্য। তিন জন রাইফেলধারী,— একজন ক্যাপ্টেন, একজন সার্জেন্ট, আর একজন প্রাইভেট বাচ্চাটাকে প্রতিমার পায়ের সাথে বেঁধে শুরু করল আস্ফালন আর জেরা। বাচ্চাটা বলে, 'আমি জানি না। আমি শুধু ঘুঁটে কুড়ুতে আর গাছড়া তুলতে জানি। লোকে আমাকে বললে আমি কী করব? ক্যাপ্টেন এতে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রতিমার পায়ে ছেলেটার মাথা ঠুকতে লাগল। 'প্রকৃত সম্রাটকে হয়তো মেরেই ফেলা হত; কিন্তু তখনই আক্রান্ত হল ক্যাপ্টেন নিজে। আ তো ফু-চিং আর বাঘা লি-র হাতে প্রাণ গেল ক্যাপ্টেনের। প্রাইভেটকে আটক করা হল। পালিয়ে বাচল সার্জেন্ট। প্রকত সম্রাটকে উদ্ধার করা হল। আ তো তাকে বলল, 'যা এক ছুটে বাড়ি চলে যা!'

বিপ্লবী বাহিনীর হাতে জমা হল তিনটে রাইফেল আর সব কার্তজ।

'আমার শিয়াংকে ফিরিয়ে দিন।'

১৯৩১ সালে জাপান যখন চীনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে তখন চীনের কমিউনিস্ট পার্টিই সবার আগে জনগনকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য ডাক দেয়। এই আহ্বানে সমগ্র জাতিই সাড়া দিয়েছিল। ১৯৩২ সালে জাপানী সৈন্য সাংহাই শহরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই সময়ে চিয়াং কাইশেকের সমঝোতার নীতির বিরুদ্ধে খোদ কুও মিনতাং-এর ১৯ নম্বর রুট আর্মি বিদ্রোহ ঘোষণা করে; —তারা শেষ পর্যন্ত জাপানীদের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহও ব্যর্থ হয়; কারন যে কোন ভাবে কমিউনিস্টদের দমন করার পাশাপাশি চিয়াং কাইশেক বিদেশী শক্তির কাছে আত্মসমর্পনের নীতি নিয়েই চলছিলেন।

এই পটভূমিকায়, ১৯৩২-এর ৮ই সেপ্টেম্বরে লেখা 'যুদ্ধের কাল' গল্পটিতে প্রতিফলিত হয়েছে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মিঃ লি এবং সংগ্রামী শ্রমিক শিয়াং ও তার সঙ্গী চুন-শেঙ-এর বিপরীতধর্মী মানসিকতা। —সাংহাইতে যখন বোমা পড়ল, আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ল ঘন বসতি এলাকায়, মজুরদের ডেরাগুলো পুড়ে ছাই হল, অসংখ্য উদ্বাস্তুকে ঘুমাতে হল রাস্তায়— শ্রমিক দুজন তখন জাপানীদের মেরে ভাগানোর জন্য যুদ্ধে গেল। মিঃ লি একবার তাকালেন তার প্রতিবেশী শিয়াং আর তার সঙ্গীর পেশীবাহুর দেহের দিকে, তারপর তাকালেন নিজের সাদা ধবধবে হাতের দিকে। মনে মনে তিনি ভাবলেন, পার্থক্যটা বিরাট; জীবনে প্রত্যেককেই নিজের নিজের পথ ধরতে হয়। মিঃ লি'র নিজের পথ হল বৌ-বাচ্চা নিয়ে কোনো একটা 'বিদেশী বিশেষ সুবিধার এলাকায় ঢুকে পড়া, যাতে পরিবারের সকলের প্রাণ বাঁচে। আর শিয়াং ও চুন শেঙ-এর পথ হল আগ্রাসী জাপান শক্তির সাথে লড়াই করা, যাতে দেশটা বাঁচে। তারা ১৯ নম্বর রুট আর্মিতে যোগ দিল (যদিও তাদের বন্দুক দেওয়া হল না); তারা আহতদের বহন করল বা ট্রেঞ্চ খুঁড়ল সারা দিন রাত। স্বপ্ন দেখল তারা ট্রেঞ্চ থেকে লাফিয়ে উঠে গ্রেনেট ছুঁড়ছে, আর টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে জাপানী ট্যাংকগুলো। কিন্তু তাদের স্বপ্ন দেখার পরিনাম হল ভয়ংকর। কুওমিনতাং-এর আত্মসমর্পনের নীতি অনুসারে ১৯ নম্বর রুট আর্মিকে পিছ হটতে হল। শিয়াং আর তার সঙ্গী এর প্রতিবাদ জানানোয় তাদের খুন করা হল।

সাংহাই শহরের ১২ মাইল ব্যাসের মধ্যে থেকে সমস্ত চীনা সৈন্য সরে যাবার পর যুদ্ধ থামল। যুদ্ধ বিরতির শর্ত নিয়ে দুই দেশের শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে অসংখ্য বৈঠক হল: অবশেষে সই হল চক্তিপত্র। শ্রমিকদের বস্তিগুলো অবশ্য ধ্বংসস্তূপ হয়েই পড়ে থাকলো।

মিঃ লি এক সময় বরখাস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠনের জন্য কিছু করেছিলেন। যুদ্ধ থেমে যাবার পর তিনি খানিকটা গাঁইগুই সহ মাথা নিচু করেই কোম্পানীর অফিস থেকে দয়াদাক্ষিন্য নিয়ে এলেন— একশ' ডলারের কিছ বেশি। পাঁচটা মখের অন্ন জোগাতে হবে. বাডিওয়ালা ভাড়া চাইছে। কম কথা!

শিয়াং-এর বৌ ততদিনে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। অফিস থেকে ফেরার পথে তার সাথে মিঃ লি'র দেখা হল। বিচিত্র বেশ, চুলগুলো আলুথালু, ছাইরঙা মুখ, পাকানো দু চোখের শাদা অংশ ঝকমক করছে। প্রথমে সে করুণ গলায় বলে উঠলো, 'আমার শিয়াং কে ফিরিয়ে দিন।' তারপর কান ফাটানো চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আমি জানি, সবাই দল বেঁধেছিল শিয়াং-এর বিরুদ্ধে, অস্বীকার করবেন না। আপনিও আছেন তার মধ্যে। আজ খঁজে পেয়েছি আপনাকে। অস্বীকার করবেন না।'

মিঃ লি শিউরে উঠলেন।

উপসংহার বা আপাতত ঃ শেষ কথা—

আলোচনা নয়, এতক্ষণ যা কিছু বলা হল তা আসলে লেখক মাও তুন এবং তাঁর চারটি গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই বইয়ের আরো নটি গল্প সম্পর্কে কিছুই বলা হল না। তবু আমার মনে হয় পাঠক এই লেখাটি পড়ে মাও তুন-এর সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারেন। আমার মতে 'বসন্তের রেশমগুটি'র প্রাসঙ্গিকতা আজও আছে। লক্ষ্য করে দেখুন শুধু ২০০৫ সালেই চীনের গ্রামাঞ্চলে ৮৭ হাজার কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। এর বেশির ভাগটাই হয়েছে 'বিদেশী শয়তান' আর চীনের বর্তমান 'কমিউনিস্ট' পার্টির যোগসাজশে তৈরী তথাকথিত 'উন্নয়ন'-এর হামলার বিরুদ্ধে।

অভূতপূর্ব সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে দমন করা হচ্ছে এই কৃষক প্রতিরোধ। ভাড়াটে গুণ্ডা ও পুলিশের সাথে সাথে নামানো হচ্ছে সেনাবাহিনী। তবু আন্দোলনের ধারা অব্যাহত। আমাদের দেশের কথা, বিশেষত আমাদের রাজ্যের কথা সবাই জানেন। শাসক শিবিরের অত্যাচার যত বাড়ছে গরিব-মেহনতী মানুষ ততই জেগে উঠছে। আর যখনই এটা ঘটতে থাকে, বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, যারা লড়তে চায় তারা বারবার ফিরে তাকায় পূর্বসূরীদের লড়াকু ঐতিহ্যের দিকে, অতীতের সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিতে চায়। আমার এই সামান্য লেখাটি যদি সেক্ষেত্রে এতটক কাজে লাগে আমি কতজ্ঞ থাকবো।

বসন্তের রেশমগুটি
মা ও তুন
মূল বই
'স্প্রিং সিল্কওয়ার্মস অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ'
প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন

ফারুক আহমেদ সম্পাদিত

উদার আকাশ

দপ্তর
ঘটকপুকুর. পো: বি গোবিন্দপুর.
ভাঙড়. দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭৪৩৫০২
মোবাইল: ৯৭৩৩৯৭৪৪৯৮

প্রকাশিত হয়েছে
শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ

'দিগন্ত'

প্রাপ্তিস্থল: সাহিত্যজগৎ. ৫৩/১/১ নীলমণি সরকার স্ট্রীট. কলকাতা-৯০
বিশ্বাস বকস্টল. কমার্সিয়াল কমপ্লেক্স. বহরমপর.
বককর্ণার. বহরমপর